Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 85
January-March, 2026

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-03-07
Published : 2026-05-10

DOI: 10.58666/iab.v22i85.347

The Islamization of Existing Laws in Bangladesh: Challenges and Pathways to Transformation

Ahmad Ali*

Abstract

Notwithstanding Bangladesh's status as a Muslim-majority state, a significant portion of its extant laws is inherited from the colonial era, predicated primarily upon secular Western legal philosophy. Consequently, various structural and institutional limitations and impediments are observed in the comprehensive and efficacious implementation of the principles of Sharia-based justice, social equity, and moral rectitude. This article succinctly analyzes the concept of law, an introduction to Islamic law, the theoretical foundations of the Islamization of laws, and the historical evolution of theBangladeshi legal system.Furthermore, within the democratic framework, the existing challenges to the Islamization of the prevailing legal system in Bangladesh are identified, and potential, pragmatic remedial strategies are presented through comparative and analytical methodologies. This research endeavors to construct an integrated, balanced, and applicable perspective in light of the Qur'an, Sunnah, various jurisprudential (Fiqh) schools, and modern legal thought, which may contribute significantly to legal reform, the establishment of a justice-based society, and sustainable policy development within the context of Bangladesh.

Keywords : Islamic Law, Islamization of Laws, Legal System of Bangladesh, Colonial Legacy, Gradual Reform, Justice.

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ইসলামিকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হলেও এর বিদ্যমান আইনসমূহের একটি বৃহৎ অংশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, যা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য আইনদর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত। এর ফলে ইসলামী

* Dr. Ahmad Ali is a Professor Department of Islamic Studies University of Chittagong. E-mail: drahmadiscu@gmail.com

শরীয়াভিত্তিক ন্যায়বিচার, সামাজিক সুবিচার ও নৈতিক শুদ্ধতার নীতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আইনের ধারণা, ইসলামী আইনের পরিচয়, আইনের ইসলামিকরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বাংলাদেশের আইনব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিসরে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থায় আইনের ইসলামিকরণে বিদ্যমান সমস্যাবলি চিহ্নিত করে সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত উত্তরণ কৌশলসমূহ তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহ, বিভিন্ন ফিকহী মতবাদ এবং আধুনিক আইনচিন্তার আলোকে একটি সমন্বিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রয়োগযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইন সংস্কার ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই নীতিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

মূলশব্দ : ইসলামী আইন, আইন ইসলামিকরণ, বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, পর্যায়ক্রমিক সংস্কার, ন্যায়বিচার।

১. ভূমিকা

আইনব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রের আদর্শিক কাঠামো, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দর্শনের মৌলিক প্রতিফলন। ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড নির্ধারণ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা চিহ্নিতকরণ এবং শাসন ও শৃঙ্খলার নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনব্যবস্থা সর্বাধিক কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ, যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম। এ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম ও শরীয়ার প্রভাব স্পষ্ট ও গভীরভাবে প্রোথিত। একজন মুসলিমের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপেই শরীয়া নীরবে সামাজিক ও আচরণগত শৃঙ্খলা গঠনে ভূমিকা পালন করে। নবজাতকের জন্ম উপলক্ষে আযান প্রদান, নামকরণ ও আকীকা থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার বণ্টন, বিবাহ ও তালাকের বিধান, এমনকি জানাযা ও দাফনের রীতিপদ্ধতি পর্যন্ত, জীবনের এসব গুরুত্বপূর্ণ আচার ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন শরীয়ার নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয়। একইভাবে সামাজিক জীবনে সততা, ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়পরায়ণতা, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মতো নৈতিক অনুশীলনসমূহেও শরীয়ার শিক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। একজন সাধারণ মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি যথা, ইবাদত, কর্মজীবন ও সামাজিক দায়িত্বের সমন্বয় শরীয়া কেবল একটি আইনগত বিধান হিসেবে নয়; বরং একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন।

তবে এ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বিপরীতে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার একটি বৃহৎ অংশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রাপ্ত, যা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য আইনদর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত। এর ফলে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ন্যায়বিচার, সামাজিক সুবিচার, সুশাসন ও নৈতিক শুদ্ধতার নীতিসমূহ

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা এবং সমাজে প্রচলিত ধর্মীয়বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন ও সামঞ্জস্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল স্তরের জন্য সুসংহত ও সুস্পষ্ট আইনগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী আইন বা শরীয়া কেবল কতিপয় নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং নৈতিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত একটি সর্বজনীন ও কল্যাণমুখী আইনব্যবস্থা। কিন্তু এ আদর্শিক পূর্ণতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়ার প্রয়োগ বাস্তবে অত্যন্ত সীমিত। পারিবারিক আইন ব্যতীত দণ্ডবিধি, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক আইন এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ইসলামী নীতিমালার কার্যকর প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত।

এই প্রেক্ষাপটে 'আইন ইসলামিকরণ' প্রসঙ্গটি কেবল তাত্ত্বিক বা আদর্শিক আলোচনার পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবায়নযোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে নতুনভাবে বিবেচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর সীমারেখার মধ্যে ইসলামী আইনগত নীতিমালাকে কীভাবে সুসঙ্গত, কার্যকর ও সাংবিধানিকভাবে সমন্বিত করা যেতে পারে–এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও নিরূপণ সমসাময়িক আইনতাত্ত্বিক বিতর্ক ও নীতিনির্ধারণী আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

একই সঙ্গে একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো–সাম্প্রতিক সময়ে কিছু চিন্তাধারা, গণমাধ্যম ও একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী মহলে এমন একটি ধারণা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে, শরীয়া একটি মধ্যযুগীয়, অসহিষ্ণু আইনব্যবস্থা, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শরীয়া সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা কেবল ভ্রান্তই নয়; বরং তা ইসলামোফোবিয়ার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আইনের ধারণা, ইসলামী আইনের পরিচয়, আইনের ইসলামিকরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বাংলাদেশের আইনব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুসংহত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমারেখার মধ্যে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থায় আইন ইসলামিকরণে বিদ্যমান কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক সমস্যাবলি চিহ্নিত করে সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত উত্তরণকৌশলসমূহ তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

২. আইনের পরিচয়

'আইন' শব্দটির উদ্ভব ফারসী আইন (آئین) শব্দ থেকে। শাব্দিক অর্থে আইন বলতে বোঝায়, নিয়ম, নীতি, বিধান, শৃঙ্খলা, নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা সুসংগঠিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ

কোনো কাজ বা কার্যক্রম যে নিয়ম বা পদ্ধতির অনুসরণে পরিচালিত হয়, সেই নিয়ম-পদ্ধতিকেই সাধারণ অর্থে আইন বলা হয়। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দির রচনাবলিতে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আব্বাসী খলীফা আল মানসূরের শাসনামলের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা (১০৬-১৪২ হি.) ফারসী ভাষা থেকে যেসব গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে 'আইন নামা' (آئین نامه) নামক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও ছিল। এই গ্রন্থে বিভিন্ন অপরাধ ও শাস্তি, চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা, সমাজের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণবিধি এবং শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা সুসংবদ্ধভাবে আলোচিত হয়েছে।[১] ঐতিহাসিক ইবনুন নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল *'ফিহরিস্ত'*-এ আইন শব্দসম্বলিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, যা থেকে তৎকালীন সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ও গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

বাংলা ভাষায় 'আইন' শব্দটি সাধারণত ইংরেজি law–এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; তবে lawশব্দটি প্রসঙ্গভেদে সামগ্রিক আইনব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ আইন বা আইনের নীতিমালা–বিভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। ইংরেজি পরিভাষায় act শব্দটি সাধারণত আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতিশব্দ হিসেবে সাধারণত 'কানুন' (قانون) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়–যেমন বলা হয়, قانون الشركة (কোম্পানি আইন); তবে ইসলামী আইনতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'শরীয়া' (شريعة) শব্দটি অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

পারিভাষিক অর্থে আইন বলতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, অনুমোদিত ও কার্যকর এমন একগুচ্ছ বাধ্যতামূলক বিধি-নিয়মকে বোঝায়, যা জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যার লঙ্ঘনের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান থাকে। সমাজে শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন একটি অপরিহার্য উপাদান।

নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও দার্শনিকের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

প্রখ্যাত আইনদার্শনিক জন অস্টিন (John Austin)-এর মতে,

> Law is the command of the sovereign backed by sanction. "আইন হলো সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের আদেশ, যা অমান্য করলে শাস্তি প্রয়োগ করা হয়।"[৩] অর্থাৎ আইন হচ্ছে এমন একটি নির্দেশ, যা মানতে জনগণ বাধ্য এবং অমান্য করলে দণ্ড আরোপ করা হয়।

---

1. Ibn al-Nadīm. *Al-Fihrist.* Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1978, 172; Rūḥul Amīn. *Islāmī Āiner Uts.* Ḍhākā: Bangladesh Islamic Law Research& Legal Aid Center, 2013, 15.
2. Ibn al-Nadīm. *op.cit.*, 198.
3. Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Edited by Sarah Austin. London: John Murray, 1861, pp. 88–89.

বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজ্ঞ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন (William Blackstone)-এর মতে,

> Law, in its most general and comprehensive sense, signifies a rule of action prescribed by some superior, and which the inferior is bound to obey. "আইন, তার সবচেয়ে সাধারণ এবং ব্যাপক অর্থে কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আচরণবিধি, যা অধঃস্তনদের অবশ্যই পালন করতে হয়।"[৪]

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জন উইলিয়াম স্যালমন্ড (John William Salmond)-এর মতে,

> Law is the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. "আইন হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রয়োগযোগ্য নীতির সমষ্টি।"[৫]

ইসলামী আইন ও সমাজচিন্তক মান্না আল কাত্তান-এর মতে,

> مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجتها.
>
> আইন (কানুন) হলো ওইসব নীতি, বিধি ও নিয়মের সেই সমষ্টি, যা কোনো জাতির জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করেন।[৬]

সার্বিকভাবে বলা যায়, আইন হলো সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎ বাধ্যতামূলক বিধি-নিয়মের সমষ্টি। উল্লেখ্য, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত আইন বিভিন্ন উৎস ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হতে পারে। কখনো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিধান থেকে আইন সৃষ্টি হয়, যা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। আবার নির্বাহী বিভাগ ডিক্রি, আদেশ ও প্রবিধানের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, সাধারণ আইনভিত্তিক বিচারব্যবস্থায় বিচারকদের রায় ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে নজির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহ ও রাসূল ﷺ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারেও আইন প্রণীত ও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩. ইসলামী আইনের পরিচয়

ইসলামী আইনের ধারণা মানবরচিত আইনের ধারণা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। মানবরচিত আইন সাধারণত মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং সময়-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয় এবং পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য বহন করে।

4. Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England*. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1765, p. 44.
5. Salmond, John William. *Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 1902, p. 1
6. Kattān, Mannā‘ Khalīl. *Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī.* Al-Qāhirah: Maktabat Wahbah, 2001, 12

পক্ষান্তরে ইসলামী আইন তার উৎস, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। ইসলাম মানবজীবনকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করে। একদিকে এটি স্রষ্টার সাথে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে সুসংহত ও সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ককে ন্যায়, ভারসাম্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের এ দ্বিবিধ সম্পর্ক, তথা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক (হুকুকুল্লাহ) এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক (হুকুকুল ইবাদ) পরিগঠন, পরিশীলন ও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ইসলামী শরীয়তে যে নীতিমালা, বিধিবিধান ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তার সমষ্টিগত রূপই ‘ইসলামী আইন’। ইসলামী আইন ‘শরীয়া আইন’ নামেও পরিচিত। বিশিষ্ট ইসলামী আইনজ্ঞ ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী রাহ. শরীয়তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

> الشريعة هي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده لتنظيم علاقاتهم بربهم وبالناس.
>
> ইসলামী আইন (শরীয়া) হলো সেই বিধানসমূহ, যা আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের সঙ্গে তাঁর এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করেছেন।[৭]

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ‘লা মওদুদী রাহ. বলেন,

> ইসলামী আইন (শরীয়া) হলো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রদত্ত সেই পূর্ণাঙ্গ বিধানব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে।[৮]

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও আইনতাত্ত্বিক N. J. Coulson ইসলামী আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> Islamic law, in classical Islamic theory, is the revealed will of God, a divinely ordained system preceding and not preceded by the Muslim state, controlling and not controlled by Muslim society.[৯] "ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামী আইন আল্লাহর ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশ; এটি মুসলিম সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক ও আইনগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ইসলামী আইন হলো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি, যেগুলোর প্রণয়ন ও নির্ধারণে প্রধানত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস–এ চারটি উৎস অনুসৃত হয়। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী আলিমুজ্জামান ইসলামী আইনের একটি সমন্বিত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়–

7. Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* Bayrūt: Dār al-Fikr, 1986, 18.
8. Mawdūdī, Sayyid Abū al-A‘lā. *Islāmī Āin o Saṅbidḥān* (trans. Muḥammad ‘Abdus Salām). Ḍhākā, 2008, 39-41.
9. Coulson, N. J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, P. 2

ইসলামী আইন হলোপবিত্র কুরআনে বিধিবদ্ধ, হাদীসে নির্দেশিত, আলিমগণের ঐকমত্যের (ইজমা') ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তুলনামূলক অবরোহন প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলি; যার আলোকে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক পরিচালিত হয়।[১০]

সার্বিকভাবে বলা যায়, ইসলামী আইন কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক বিধান বা শাস্তিমূলক আইনের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার, নৈতিক শুদ্ধতা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে সার্বিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যেগুলো পালন করা একজন মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য, এ সকল সামগ্রিক বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনার নামই ইসলামী আইন।

৪. আইন ইসলামিকরণের ধারণা

আইন ইসলামিকরণ (Islamization of law) বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের বিদ্যমান আইনব্যবস্থা ও শাসন কাঠামোকে ইসলামী শরীয়ার নীতি ও বিধানের আলোকে পুনর্গঠন (Reconstruction), অভিযোজন (Adaptation) বা রূপান্তর (Transformation) করা হয়। এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের প্রধান ও মৌলিক উৎস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়এবং সেসব উৎসের ভিত্তিতেই দেওয়ানি, ফৌজদারি, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, নৈতিকতা ও সামগ্রিক সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্পন্ন হয়। আইন ইসলামিকরণ কেবল কিছু নির্দিষ্ট আইনি বিধানের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বিচারব্যবস্থা, শাসন কাঠামো এবং সামাজিক রীতিনীতি–সবকিছুকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি বিস্তৃত ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

সংক্ষেপে বলা যায়, আইন ইসলামিকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি সমাজের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে ইসলামী নীতি, মূল্যবোধ ও শরীয়াভিত্তিক আইনসমূহকে একীভূত, অভিযোজিত বা কার্যকর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য কেবল বিধিবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা নয়; বরং সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এই প্রেক্ষাপটে শরীয়ার উদ্দেশ্যাবলি (মাকাসিদে শরীয়া) হিসেবে মানবজীবন, ধর্ম, সম্পদ, বংশ, ইজ্জত-আব্রু ও বিবেকের সুরক্ষা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এসব উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় বিধানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিক ও দার্শনিক দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, যা

10. Alimuzzamān Chowdhurī. *Islamic Jurisprudence o Muslim Āin.* Ḍhaka: Comilla Law Book House, 2008, 26; Rūḥul Amīn. *op.cit.*, 25.

আইনব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শের দিকে পরিচালিত করে।

আইন ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ–

- **শরীয়া আইনের বিধিবদ্ধ রূপদান:** কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ও প্রতিপাদিত ইসলামী আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহকে রাষ্ট্রের আইনসভা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আইনে রূপদান করা।
- **আইনি সংস্কার:** বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা, সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলোকে ইসলামী আদর্শ, ন্যায়বিচার ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
- **শরীয়া আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ:** বিধিবদ্ধ শরীয়া আইনসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক কাঠামো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োগব্যবস্থা সুদৃঢ় করা।
- **বিচারব্যবস্থার রূপান্তর:** ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে শরীয়া আদালত, বিশেষ বিচার বিভাগীয় বেঞ্চ বা ইসলামী আইনভিত্তিক বিচারিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা।
- **ফৌজদারি আইন ইসলামিকরণ:** অপরাধ ও শাস্তিসংক্রান্ত ফৌজদারি আইনসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ফিকহের আলোকে পুনর্গঠন করা এবং হুদূদ, কিসাস ও তাযীর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা।
- **সিভিল আইন ইসলামিকরণ:** চুক্তি, সম্পত্তি, দায়-দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণ এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক বেসরকারি লেনদেন সংক্রান্ত সিভিল আইনসমূহকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
- **অর্থনৈতিক ও আর্থিক আইন ইসলামিকরণ:** ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, বীমা, করব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সুদমুক্ত ও শরীয়াসম্মত কাঠামোয় রূপান্তর করা।
- **পারিবারিক আইন প্রয়োগ:** বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়সমূহে 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' কার্যকরভাবে প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করা।
- **সামাজিক ও নৈতিক পুনর্গঠন:** সমাজের নৈতিক মানদণ্ড, শালীনতার ধারণা, সামাজিক আচরণ ও রীতিনীতিকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্গঠন করা।

৫. বাংলাদেশের আইনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি

৫.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাব

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা ঘটে, যা কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব এ অঞ্চলের আইন ও বিচারব্যবস্থায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী শাসনকার্যকে কার্যকর ও নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে একটি একীভূত ও কেন্দ্রীকৃত আইন কাঠামো প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৮৭২ সালের প্রমাণ আইন এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং দেওয়ানি কার্যবিধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয়। এসব আইন মূলত ইংরেজ কমন ল' (Common Law)[১১] ও পাশ্চাত্য আইনদর্শনের আদলে গঠিত ছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনসমূহের দার্শনিক ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও উপযোগবাদী চিন্তাধারা, যেখানে আইনকে সামাজিক উপযোগিতা ও প্রশাসনিক মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে। ফলে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক নৈতিকতা, ন্যায়বোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে এসব আইনের বহু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠেছে।

এ প্রেক্ষাপটে ফৌজদারি আইনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য। যেমন- চুরি, শারীরিক আঘাত বা হত্যার মতো অপরাধের বিচার ধর্মনিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের আওতায় সম্পন্ন হতো এবং শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড প্রদান করা হতো; ঐতিহ্যবাহী হুদূদ শাস্তির বিধান এসব ক্ষেত্রে প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। তদুপরি রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থায় কোনো স্বতন্ত্র ইসলামী আদালত বা শরীয়াভিত্তিক ফৌজদারি বিধির অস্তিত্বও ছিল না; বরং দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আদালতই একই জাতীয় ও অভিন্ন আইনি কাঠামোর অধীনে বিচারকার্য পরিচালনা করতো।

এর অনিবার্য পরিণতিতে মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত কাজী ব্যবস্থা, ফিকহভিত্তিক বিচারপ্রক্রিয়া এবং শরীয়ানির্ভর আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনব্যবস্থা ধর্মীয় বিধানকে রাষ্ট্রীয় আইন থেকে কার্যত পৃথক করে বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় পরিচালিত করে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রভাব পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহের আইনব্যবস্থার ওপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে পরিফলিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আইনী কাঠামো যে অংশে ধর্মীয় বিধানের প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তা হলো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন। বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো এখানে সম্প্রদায়ভিত্তিকভাবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়

১১. ইংরেজ কমন ল' হলো ইংল্যান্ডে উদ্ভূত একটি বিচারক-সৃষ্ট আইনব্যবস্থা, যা আদালতের রায়ও পূর্ববর্তী মামলার নজিরের ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করেছে। নরম্যান বিজয়ের (১০৬৬ খ্রি.) পর রাজকীয় আদালতসমূহ সারা দেশে অভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় বিভেদ দূর করে যে সাধারণ আইন গড়ে তোলে, সেটিই কমন ল' নামে পরিচিত। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো সার্বজনীন প্রযোজ্যতা, বিচারিক নজিরের বাধ্যতামূলক অনুসরণ এবং প্রথাভিত্তিক ধারাবাহিক বিকাশ। এ আইন যেহেতু সমগ্র দেশের জন্য সাধারণ বা অভিন্ন (common) আইনে পরিণত হয়, তাই একে কমন ল' বলা হয়।

আদালতের তত্ত্বাবধানে নিজেদের ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইন অনুসরণ করে থাকে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তিগত আইন ইসলামী আইন (শরীয়া) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা বিভিন্ন আইন ও বিচারিক চর্চার মাধ্যমে আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর প্রধান ভিত্তি হলো ১৯৩৭ সালের মুসলিম পার্সোনাল ল' (প্রয়োগ) আইন, যার মাধ্যমে বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার বিষয়ে মুসলমানদের জন্য ইসলামের বিধান কার্যকর হওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।[১২]

৫.২ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থায় আংশিকভাবে ইসলামী বিধান সংযোজনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-আদর্শিক প্রেক্ষাপট ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছিল ইসলামী পরিচয়ের দাবিকে কেন্দ্র করে; ফলে সংবিধান প্রণয়ন ও আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে রাজনীতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক ও মতানৈক্য বিরাজ করছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ'একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিবাহ ও তালাক প্রক্রিয়া, বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে সংস্কার আনা হয়।[১৩] যদিও এসব সংস্কারকে ইসলামী নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, বাস্তবে সেগুলো সামাজিক বাস্তবতা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে গৃহীত সীমিত পরিসরের আইনগত হস্তক্ষেপ, যা ইসলামী শরীয়ত, ব্রিটিশ শাসনামলের আইনগত উত্তরাধিকার এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় কল্যাণচিন্তার সমন্বয়ে প্রণীত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনব্যবস্থা, বিচারিক কাঠামো এবং সাংবিধানিক দর্শন তখনও প্রায় পুরোপুরি মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মনিরপেক্ষ আইনদর্শনের অধীনেই পরিচালিত হচ্ছিল।

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা থাকলেও, আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থায় শরীয়াকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। 'ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিল' গঠনের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তার সুপারিশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরামর্শমূলক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল।

12. Shāhedī, Muḥammad 'Īsā, ed. *Prachalita Bichārabyabasthāy Sharī'ah Āiner Prayōg-Paddhati (Seminar Smārak).* Ḍhākā: Baytush Sharaf Islāmī Gabeshanā Kendra, 2025, 25

13. উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের আগে সালিশ পরিষদ থেকে অনুমতি গ্রহণ ও বর্তমান স্ত্রীর/স্ত্রীদের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা; তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রদানের প্রথা সীমিত করা, তালাক উচ্চারণের পর তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর না হয়ে নোটিশ ও অপেক্ষাকাল (৯০দিন) নির্ধারণ করা এবং এ সময়ের মধ্যে মীমাংসার সুযোগ রাখা; পিতা মারা গেলে তার নাতি-নাতনিদের (পুত্র/কন্যার সন্তান) উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা; বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন আদর্শিক পথ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান-এ ধর্মনিরপেক্ষতাকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যতম মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণের ধারণা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থায় ইসলামিকরণের উদ্যোগ কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে এবং আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ আইনদর্শনই প্রাধান্য পায়। তবে এই পর্যায়েও ইসলামী আইনসম্পর্কিত সব কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বহাল থাকে এবং পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজী আদালত ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভূমিকা আংশিকভাবে অব্যাহত থাকে।[১৪]

পরবর্তীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে এ ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯৭৭ সালের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মীয় উপাদানের পুনঃপ্রবেশ ঘটে।

পরবর্তীকালে ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংযোজন করা হয়। যদিও একই সঙ্গে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখা হয়, তবুও এই সংশোধনীর মাধ্যমে

14. উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সাল থেকে মুসলিমদের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত পরিবার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর আওতায় পরিচালিত ছিল। এসব আদালতে বিচারকগণ রায় প্রদানের সময় প্রযোজ্য দেওয়ানি আইনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বিবেচনায় নিয়ে রায় প্রদান করতেন–বিশেষত বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায়। একই সঙ্গে, বিয়ে ও তালাক নিবন্ধনের দায়িত্ব সরকারি সনদপ্রাপ্ত কাজী কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও নীতিগত তত্ত্বাবধান করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর ফলে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রয়োগ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হতো। পরবর্তীকাপোরিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করা হয়েছে এবং পরিবার আদালতসমূহ বর্তমানে উক্ত আইনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইন বিদ্যমান রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় ব্যক্তিগত আইন মূলত ঐতিহ্যগত শাস্ত্রভিত্তিক নীতি এবং ঔপনিবেশিক যুগের কিছু প্রযোজ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; উদাহরণস্বরূপ, Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946 এবং Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 প্রভৃতি আইন এখনো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কার্যকর। অপরদিকে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ পৃথক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যথা– The Christian Marriage Act, 1872 এবং The Divorce Act, 1869। এভাবে রাষ্ট্র ধর্মীয় বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আইন কাঠামো বজায় রেখেছে, যা বাংলাদেশের আইনব্যবস্থায় একধরনের বহুত্ববাদী নীতির প্রতিফলন ঘটায়।

ধর্মীয় সমতা এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের প্রতি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার বিকাশে ইসলামী শরীয়া ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনদর্শনের মধ্যে এক ধরনের স্থায়ী টানাপোড়েন বিদ্যমান ছিল। তবে বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা কখনোই উল্লেখযোগ্যভাবে শরীয়াভিত্তিক রূপ লাভ করেনি। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামো মূলত ঔপনিবেশিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনদর্শনের ধারাতেই বিকশিত হয়েছে। ফলে ইসলামী বিধান কার্যত (ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত ও বিতর্কিত) পারিবারিক আইন, কিছু আর্থিক ব্যবস্থাপনা (যেমন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিধিনিয়ন্ত্রণ) এবং ব্যক্তিগত ধর্মাচারের সীমিত পরিসরের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে।

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়াভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন, এই দুই ব্যবস্থার সহাবস্থান বাংলাদেশের আইনি কাঠামোয় ক্ষেত্রবিশেষে জটিলতা ও টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে। বিশেষত মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের কিছু বিধান সংবিধানের সমতা ও বৈষম্যহীনতার নীতির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান। ইসলামী ফারায়েজ অনুসারে, কোনো নারী উত্তরাধিকারী (যেমন কন্যা বা বোন) একই শ্রেণির একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর তুলনায় সাধারণত অর্ধেক অংশ সম্পত্তি লাভ করেন। এই বিধান সংবিধানের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা, বিশেষত অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮-এ ঘোষিত আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের নীতির সঙ্গে আপাত সাংঘর্ষিক।

নারীর সম্পত্তিগত উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ইসলামী বিধান বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ CEDAW-সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের নির্দিষ্ট ধারার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক আপত্তি (reservation) সংরক্ষণ করেছে। এটি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনক্ষেত্রে শরীয়াভিত্তিক আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।[১৫] একইভাবে, বহুবিবাহের অনুমোদন কিংবা তালাকের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগত কাঠামোর মতো প্রথাগত ইসলামী বিধানসমূহ (কিছু আইনি ও প্রশাসনিক সংশোধনের মধ্য দিয়ে) রাষ্ট্রীয় আইনি ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। তবে এসব বিধান ধর্মনিরপেক্ষ লিঙ্গসমতা ও সমান অধিকারের আধুনিক ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর ফলে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো কার্যত ব্যক্তিগত আইনক্ষেত্রে

15. উল্লেখ্য, ২০১১ সালে সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও সম্পত্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। খসড়ায় নারীর উত্তরাধিকারে সমতার ইঙ্গিত থাকায় ধর্মীয় রক্ষণশীল মহল তীব্র বিরোধিতা করে। তারা দাবি করে, সমান উত্তরাধিকার শরীয়াবিরোধী এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাংবিধানিক অবস্থানের পরিপন্থী। এই চাপের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত নীতির ওই অংশগুলো কার্যকর করেনি; চূড়ান্ত নথিতে নারীর সমান উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি।

ধর্মনিরপেক্ষ আইনের একটি ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধর্মীয় আইনই কর্তৃত্ব বহন করে।

এই দ্বৈত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশের বিচারবিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এমন আইন ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ বাতিল করেছে, যেগুলো সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র বা মৌলিক অধিকারবিরোধী বলে বিবেচিত হয়েছে। ২০১০ সালের ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী মামলায় আদালত সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারণকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। একই ধারাবাহিকতায়, বিচারবিভাগ ধর্মীয় বিধানের অপপ্রয়োগ রোধ করতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ২০১০-২০১১ সালে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ ফাতওয়ার নামে কোনো ধরনের আইনবহির্ভূত শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নারীদের প্রকাশ্যে চাবুক মারা বা সামাজিকভাবে হেয় করার মতো শাস্তিগুলোকে আদালত অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে রায় দেয়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, কোনো ধর্মীয় ফাতওয়ায় কারও ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চালানো যাবে না এবং এমনকি যোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়ারও কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই।

এই বিচারিক অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন শরীয়ার কোনো অনানুষ্ঠানিক প্রয়োগ বা সামাজিক প্রয়োগের ওপর প্রাধান্য পায়। উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায়ে বারবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীয়াভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন তাদের নিজস্ব পরিসরে সম্মানিত হলেও সেগুলো কখনোই সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারকে অতিক্রম করতে পারে না এবং আইনসম্মত সীমার বাইরে প্রয়োগযোগ্য নয়।[১৬]

৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ইসলামিকরণে প্রধান প্রধান সমস্যা

৬.১ সংবিধানিক আইনদর্শনগত দ্বৈততা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা হলো সংবিধানিক আইনদর্শনগত দ্বৈততা। বাংলাদেশের সংবিধানে একদিকে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আপাতবিরোধী সাংবিধানিক অবস্থান রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একদিতে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি, অন্যদিকে ব্যবহারিক জটিলতা সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ইসলামী মূল্যবোধ ও শরীয়াভিত্তিক নীতির আলোকে আইন প্রণয়নের একটি সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা প্রদান করলেও, একই

16. Shāhedī, op.cit., 26-27.

সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক নীতি রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনে ধর্মীয় বিধানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগকে সীমিত করে। ফলে আইন ইসলামিকরণের যে কোনো উদ্যোগ সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, বিচারিক পর্যালোচনা এবং নীতিগত দ্বিধার সম্মুখীন হয়, যা একটি সুসংহত সংস্কার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

এই আইনদর্শনগত দ্বৈততার বাস্তব প্রতিফলন স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী সংক্রান্ত বিচারিক রায়সমূহে। এসব রায়ে একদিকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮ ও ১২-এর আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ২ক-এর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী বিধানটি একই সঙ্গে বহাল রাখা হয়েছে। যদিও বিচার বিভাগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে, তবে রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত বিধানের সঙ্গে এর পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে নীতিগতভাবে সমন্বিত হবে, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেনি।

এর ফলে আইনপ্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একটি গভীর ব্যাখ্যাগত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। একদিকে অনুচ্ছেদ ২ক ইসলামী মূল্যবোধ বা শরীয়াভিত্তিক নীতির আলোকে আইন প্রণয়নের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে এই ধরনের উদ্যোগ অনুচ্ছেদ ৮ ও ১২-এ প্রতিফলিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। এই দ্বৈততা বিচারিকভাবে চূড়ান্তরূপে নিরসন না হওয়ায় আইনব্যবস্থার সামগ্রিক দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট থেকে যায় এবং একটি সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী আইনকাঠামো গঠনের পথে তা কার্যকর প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় আদালতের বিচারিক বিশ্লেষণেও এ দ্বৈততার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মামলার ক্ষেত্রে আদালত ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক নীতির আলোকে। ফলে রাষ্ট্রধর্মের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিচারিক বিবেচনায় কখনো সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না, আবার সিদ্ধান্তের নির্ণায়ক ভিত্তি হিসেবেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। এই দ্বিচারি বিচারিক অবস্থান রাষ্ট্রধর্মের আইনগত চরিত্র সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে বিচারিক নজিরের আলোকে আইনপ্রণেতাদের পক্ষে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, রাষ্ট্রধর্ম কি কেবল সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি নীতিগতভাবে কার্যকর কোনো আইনদর্শনগত ভূমিকা পালন করে। পরিণতিতে সংবিধানিক আইনদর্শনগত দ্বৈততা আইনপ্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তাকে আরও গভীর করে তোলে এবং আইন ইসলামিকরণকে একটি সুস্পষ্ট, ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারপ্রক্রিয়ায় রূপ দেওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৬.২ আইন ইসলামিকরণের রাজনীতিকরণ

আইন ইসলামিকরণের পথে একটি মৌলিক অন্তরায় হিসেবে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তা হলো, এই প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকরণ। আইন ইসলামিকরণ প্রায়শই একটি সুসংহত ও নীতিগত সংস্কারের বিষয় হিসেবে বিবেচিত না হয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও মতাদর্শিক প্রতিযোগিতার পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ ও বিরোধিতার প্রতীকে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দলসমূহ অনেক ক্ষেত্রে আইন ইসলামিকরণকে পর্যায়ক্রমিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিনির্ভর রাষ্ট্রীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে গ্রহণ না করে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতিনির্ভর কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিশেষত নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতিতে এ বিষয়টি কখনো জনসমর্থন আদায়ের প্রতীকী ভাষা হিসেবে, আবার কখনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এর ফলে আইন ইসলামিকরণ গভীর গবেষণা, নীতিগত ঐকমত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির দাবি হারিয়ে তাৎক্ষণিক বা স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির অধীন হয়ে পড়ে। এই রাজনীতিকরণের পরিণতিতে টেকসই, ধারাবাহিক ও আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে খণ্ডিত ও প্রতীকী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যা আইন ইসলামিকরণকে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ নীতিগত সংস্কারে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। পরিণামে বিষয়টি কাঙ্ক্ষিত আইনগত সংস্কার নিশ্চিত করার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিতর্কের চক্রেই আবদ্ধ থেকে যায়।

উপর্যুক্ত রাজনীতিকরণ ও প্রতীকী ব্যবহারের প্রবণতার দৃষ্টান্তবাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে লক্ষ করা যায়, যখন শাসনব্যবস্থার বৈধতা সংকট ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় পরিচয় ও ইসলামিক মূল্যবোধকে রাষ্ট্রীয় পরিসরে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও তা মূলত জনসমর্থন সংহতকরণ ও রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করার কৌশল হিসেবেই অধিক কার্যকর ছিল। এ ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আইনব্যবস্থা, বিচারপ্রক্রিয়া বা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ কাঠামোয় কোনো বিস্তৃত ও ধারাবাহিক ইসলামিক সংস্কার বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এই উদ্যোগটি আইন ইসলামিকরণকে কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পথে অগ্রসর না করে মূলত রাজনৈতিক বিতর্ক ও প্রতীকী অবস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে দেয়।

৬.৩ আইন ইসলামিকরণে বিশেষজ্ঞ সংকট

বিদ্যমান আইন ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো আধুনিক আইন ও ইসলামী ফিকহ, এই দুই শাস্ত্রে সমন্বিত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদের প্রকট ঘাটতি। বাস্তবতা হলো, এমন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত, যারা আধুনিক আইনব্যবস্থা, সাংবিধানিক কাঠামো, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বিচারিক ব্যবস্থার

জটিলতা সম্পর্কে সুগভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা রাখেন, সেইসাথে ইসলামী ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, মাকাসিদুশ শরীয়া (Objectives of Shariah), ফিকহুল মুওয়াযনাত (Fiqh of Balancing Interests), ফিকহুল আওলাওয়িয়্যাত (Fiqh of Priorities), ফিকহুল ওয়াকি‘ (Contextual Fiqh) প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ।

এই সংকটের একটি বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ করা যায় পাকিস্তানের Federal Shariat Court প্রতিষ্ঠার পর বহু আইনকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও, আদালতের বিচারক ও সংশ্লিষ্ট আইনপ্রণেতাদের একটি অংশ আধুনিক সাংবিধানিক আইন ও ইসলামী ফিকহ, এই দুই শাস্ত্রে সমান দক্ষ না হওয়ায় বিভিন্ন রায়ে অসামঞ্জস্য, বিলম্ব এবং প্রয়োগগত জটিলতা সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি গভীর হলেও রাষ্ট্রীয় আইন কাঠামো ও প্রশাসনিক বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে শরীআ কোর্টের রায় কার্যকর প্রয়োগে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে মালয়েশিয়া-এর অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। সেখানে দ্বৈত আইনব্যবস্থার (Civil Law ও Shariah Law) বাস্তবতায় দীর্ঘদিন ধরে আইনজ্ঞ ও ফিকহবিদদের যৌথ প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবুও দেশটির শরীয়া আদালতসমূহে বহু ক্ষেত্রে এমন বিচারক পাওয়া যায়, যাঁরা ফিকহে দক্ষ হলেও আধুনিক বাণিজ্যিক আইন, কর্পোরেট ল’ কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তি আইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে ইসলামী পারিবারিক আইন বা আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে কখনো কখনো শরীআহ আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

আরও পরিতাপের বিষয় হলোআলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের ফিকহে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহের তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণী সক্ষমতা অর্জনকে জরুরী মনে করেন না। এর ফলে পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতা, প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে উদ্ভূত নতুন আইনগত সমস্যা এবং আধুনিক আইনি কাঠামোর সঙ্গে শরীয়ার নীতিগত অভিযোজন বিষয়ে একটি বিস্তৃত ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে যায়।

এই সমন্বিত দক্ষতার ঘাটতির সরাসরি প্রভাব পড়ে আইনপ্রণেতা, বিচারক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর। তাঁদের একটি বড় অংশ ইসলামী আইনের নৈতিক দর্শন, মাকসাদভিত্তিক গভীরতা এবং বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন না। এর ফলে ইসলামী আইনকে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতা, পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং আধুনিক আইনগত চাহিদার সঙ্গে কার্যকর ও টেকসইভাবে সমন্বয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে।পরিণতিস্বরূপ, আইন ইসলামিকরণের উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং বাস্তব আইন সংস্কার ও প্রয়োগের পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়।

৬.৪ সামাজিক বিভ্রান্তি ও বিকৃত বয়ান

বিদ্যমান আইনব্যবস্থার ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ প্রায়শ উপেক্ষিত প্রতিবন্ধকতা হলো ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত বয়ান। জনপরিসরে ইসলামী আইনকে অনেক সময় অত্যন্ত সীমিত ও একমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে একে কেবল হুদূদসংক্রান্ত শাস্তিমূলক বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে 'কঠোর', 'অমানবিক' কিংবা 'মানবাধিকার-বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের বয়ান ইসলামী আইনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো, নৈতিক দর্শন ও সামাজিক উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে গড়ে ওঠে এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন কেবল দণ্ডবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর একটি বৃহৎ অংশ সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সমাজে ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত। মাকাসিদুশ শরীয়ার আলোকে ইসলামী আইন মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু ইসলামী আইনের এই কল্যাণমূলক ও মানবিক দিকগুলো উপেক্ষা করে কেবল শাস্তিমূলক উপাদানকে কেন্দ্র করে যে বয়ান নির্মিত হয়, তা স্বভাবতই একপেশে ও বিকৃত।

এই বিকৃত বয়ান শুধু সামাজিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রতিবেদনেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যামনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International) সৌদি আরব, ইরান ও সুদানের প্রেক্ষাপটে প্রণীত একাধিক প্রতিবেদনে হুদূদভিত্তিক শাস্তি, যেমন অঙ্গচ্ছেদ, প্রকাশ্য বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মর্যাদাহানিকর শাস্তি হিসেবে অভিহিত করেছে এবং এগুলোকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মৌলিক নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। একইভাবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) তার বার্ষিক World Report এবং বিভিন্ন দেশভিত্তিক বিশ্লেষণে শরীয়াভিত্তিক দণ্ডবিধিকে disproportionate punishments (অনুপাতহীন শাস্তি) ও violations of international human rights law (আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে বিশেষত হুদূদ আইন প্রয়োগকে নারীর অধিকার, ব্যক্তিগত মর্যাদা ও শারীরিক অখণ্ডতার পরিপন্থী হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

উল্লেখ্য, এসব প্রতিবেদনে ইসলামী আইনকে প্রধানত তার শাস্তিমূলক মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়। এর ফলে শরীয়ার নৈতিক দর্শন, উচ্চ প্রমাণমানদণ্ড, দণ্ড প্রয়োগে কঠোর শর্তাবলি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণমুখী লক্ষ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত থেকে যায়।

এই একমাত্রিক উপস্থাপনাই ইসলামী আইন সম্পর্কে সামাজিক বিভ্রান্তি জিইয়ে রাখে এবং জনমনে ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর পরিণতিতে

আইন ইসলামিকরণ বিষয়ে যুক্তিনির্ভর, তথ্যভিত্তিক ও গঠনমূলক সংলাপের পরিসর সংকুচিত হয়, যা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৬.৫ আন্তর্জাতিক চাপ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বিদ্যমান আইনব্যবস্থার ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে আরেকটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হলো আন্তর্জাতিক চাপ এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক-আইনগত প্রেক্ষাপট। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিসরে মানবাধিকার, নারী অধিকার ও বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইনের সঙ্গে প্রায়শই একটি সরলীকৃত ও একমাত্রিক তুলনা উপস্থাপন করা হয়। এই তুলনামূলক বয়ানের মধ্য দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর বহুমাত্রিক নীতিগত, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, যা প্রায়শই ইসলামী আইনচিন্তার পূর্ণাঙ্গ, প্রামাণ্য ও প্রাসঙ্গিক দিকসমূহকে উপেক্ষা করে।

এই প্রেক্ষাপটে একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের হুদূদ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯-কে উল্লেখ করা যায়। উক্ত আইন প্রণয়নের পর থেকেই দেশটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়। বিশেষত নারী অধিকার ও বিচারপ্রক্রিয়ার প্রশ্নে এই আইনকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যার ফলে পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী সময়ে আইন সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। একইভাবে সুদানে শরীয়াভিত্তিক দণ্ডবিধি প্রবর্তনের পর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, উন্নয়ন সহায়তা স্থগিত এবং মানবাধিকার ইস্যুকে কেন্দ্র করে বহুপাক্ষিক চাপের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে তার শাস্তিমূলক মাত্রার আলোকে বিচার করা হয়েছে, অথচ এর সামাজিক ন্যায়বিচারমূলক ও কল্যাণমুখী দর্শন উপেক্ষিত থেকেছে।

এই ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ সাধারণত জাতি সংঘের মানবাধিকার কাঠামো, বিভিন্ন কনভেনশন এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। যদিও এসব কাঠামোর লক্ষ্য মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা; বাস্তবে অনেক সময় এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ফলে ইসলামী আইনকে স্বভাবতই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা বিরোধপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপনের একটি প্রবণতা গড়ে ওঠে, যা বাস্তবতার তুলনায় অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর।

এই ধরনের বয়ান যেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামী আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন ইসলামিকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতার মুখোমুখি করে। বিশেষ করে নীতি-নির্ধারণী মহলে এ ধারণা জোরদার হয় যে, ইসলামী আইন প্রয়োগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বৈদেশিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এর ফলে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইনসংক্রান্ত সংস্কার বা প্রয়োগ প্রক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক, আংশিক

অথবা প্রতীকী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ একটি গভীর, প্রামাণ্য ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে নৈতিক, উদ্দেশ্যগত এবং কার্যকরী সামঞ্জস্য নিরূপণ করা সম্ভব। ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, এই মৌলিক মূল্যবোধগুলো উভয় কাঠামোরই অভিন্ন ভিত্তি। কিন্তু এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণের অভাব এবং একমাত্রিক আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ আইন ইসলামিকরণের প্রক্রিয়াকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরও জটিল, সংবেদনশীল ও বিতর্কিত করে তোলে।

৬.৬. ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদ

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহের ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ একটি ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যময় সমাজ, যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান করে আসছে। এই বৈচিত্র্যময় সামাজিক বাস্তবতায় আইনসমূহের ইসলামিকরণের উদ্যোগ অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ, আশঙ্কা কিংবা ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দেয়।

বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ২০১৩-২০১৪ সময়কালে ব্লাসফেমি আইন ও ধর্মীয় অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিতর্ককে উল্লেখ করা যায়। ওই সময় ইসলামপন্থী দলগুলো ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি তোলে, যা আইন ও নীতিনির্ধারণী পরিসরে ইসলামিকরণ সংক্রান্ত আলোচনাকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু একই সঙ্গে এই দাবির বিপরীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সেক্যুলার নাগরিক সমাজ এবং উদারপন্থী মহলের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয় যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় প্রণীত আইন ভবিষ্যতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার সীমিত করতে পারে। এই পরিস্থিতি স্পষ্ট করে যে, আইনকে ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

অন্যদিকে, ধর্মীয় বিভেদ কেবল সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; একই ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ভেতরেও বিভিন্ন মতবাদ, ফিকহী ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় চিন্তাধারার পার্থক্য আইন প্রয়োগ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেওবন্দী, আহলে হাদীস, বেরেলভী, অক্ষরবাদী রক্ষণশীল ব্যাখ্যাধারা এবং মাকসাদভিত্তিক উদার ব্যাখ্যাধারাসহ নানাবিধ ধর্মীয় প্রবণতা অবস্থান লক্ষণীয়। এসব ধারার মধ্যে শরীয়া আইন, দণ্ডবিধি বা সামাজিক বিধানসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে বহু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও ইসলামী আইনের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহঅভিন্ন, তথাপি ইজতিহাদের পদ্ধতি, কিয়াসের প্রয়োগ, ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার নীতি এবং মাকাসিদুশ শরীয়ার ভূমিকা নির্ধারণে

ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থানের কারণে একাধিক বৈধ ব্যাখ্যাধারা বিকশিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য ইসলামী আইনতত্ত্বের একটি স্বীকৃত ও ঐতিহাসিকভাবে সাব্যস্ত বৈশিষ্ট্য হলেও আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একটি একক, সর্বজনগ্রাহ্য ও বাধ্যতামূলক ইসলামিক আইন কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা কাঠামোগত জটিলতা সৃষ্টি করে। বিশেষত যখন ধর্মীয় বিধানসমূহকে ইতিবাচক আইন হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন এই ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য নীতিগত ঐকমত্য অর্জনের পথে অন্তরায় হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই বাস্তবতার একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হলো, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সময়ের বিনিময়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্নে একদল ফকীহ মুরাবাহা বা বায়‘ মুয়াজ্জাল চুক্তির আওতায় কিস্তিভিত্তিক বিক্রয়ে সময়ের কারণে বাড়তি মূল্য বৃদ্ধি শরীয়াসম্মত বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, এখানে ঋণের ওপর সুদ আরোপ করা হচ্ছে না; বরং পণ্যের মূল্যই নির্ধারিত করা হচ্ছে। অপরদিকে, এক দল ফকীহ একই ব্যবস্থাকে কার্যত সুদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে এর বৈধতা নিয়ে আপত্তি করেন।[১৭] এই ধরনের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, একই শরীয়াভিত্তিক মূলনীতির ভিন্ন পাঠ ও প্রয়োগ কীভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকে জটিল করে তোলে।

ধর্মীয় মতানৈক্যের পাশাপাশি সামাজিক বিভাজনের নানা মাত্রা, যেমন শ্রেণিগত বৈষম্য, শিক্ষাগত পার্থক্য, শহর ও গ্রামের সামাজিক ব্যবধান এবং আধুনিক ও প্রথাগত চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব আইন ইসলামিকরণের পথে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। আইনকে যদি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা সীমিত সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তবে তা সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি জন্ম দিতে পারে, সামাজিক সংহতি দুর্বল করতে পারে এবং এতে আইনগত সংস্কারের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই চ্যালেঞ্জের প্রতিফলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যার প্রশ্নে শিক্ষিত নগর মধ্যবিত্ত, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং শ্রমজীবী দরিদ্র শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির একটি অংশ মাকাসিদুশ শরীয়াভিত্তিক সংস্কারমূলক ব্যাখ্যার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও গ্রামীণ ও স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথাগত ফিকহী অবস্থান অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে কোনো আইনসংস্কার উদ্যোগ যখন একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাধারাকে প্রাধান্য দেয়, তখন তা অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিংবা তাদের নিজস্ব সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে একটি বিশেষ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে।

---

১৭. For more on this subject, see- Aḥmad ‘Alī. *Islāmī Banking-e Sharī ‘ah Paripālan o Laṅghan: Samasyā o Uttaraṇ Bhābnā*. Ḍhākā: Prachchhad Prakāshan, 2025, p. 240-249

একইভাবে, ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের প্রশ্নে ফাতওয়া, নারীর কর্মসংস্থান, বা সামাজিক আচরণসংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিয়ে অতীতে যে বিতর্ক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় ব্যাখ্যা যখন সামাজিক বাস্তবতা ও শ্রেণিগত বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয় না, তখন তা আইনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রতিরোধ ও মেরুকরণ সৃষ্টি করে। এই অভিজ্ঞতাগুলো নির্দেশ করে যে, আইন ইসলামিকরণ কেবল ধর্মতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যের প্রশ্ন নয়; বরং এটি সামাজিক ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বহুবিধ সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সংলাপ স্থাপনের একটি নীতিগত প্রক্রিয়া।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সমাজের ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক বিভাজনের বাস্তবতা যথাযথভাবে বিবেচনা না করে আইন ইসলামিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা প্রত্যাশিত সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

৭. বিভিন্ন দেশে আইন ইসলামিকরণ এবং বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতা

আইন ইসলামিকরণের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিম দেশের অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে এসব রাষ্ট্র ইসলামী আইনের নীতিমালা আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সমন্বয় করেছে।

মালয়েশিয়ায় একটি দ্বৈত আইনব্যবস্থা (dual legal system) কার্যকর রয়েছে, যেখানে ফেডারেল বা সিভিল আইনের পাশাপাশি শরীয়া আইন সমান্তরালভাবে প্রয়োগ করা হয়। শরীয়া আইন কেবল মুসলিম নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য; অমুসলিম জনগোষ্ঠী এর আওতাভুক্ত নয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়–যেমন বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ধর্মীয় আচরণসংক্রান্ত ক্ষেত্রে নিজস্ব শরীয়া আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে এবং এ উদ্দেশ্যে রাজ্যভিত্তিক শরীয়া আদালত পরিচালিত হয়। এসব আইনের অধীনে সীমিত পরিসরে কিছু ফৌজদারি বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১৮] এ ব্যবস্থা বহুত্ববাদী সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ইসলামী আইনের সীমিত কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পাকিস্তানে ফেডারেল শরীয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রচলিত আইনসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না–তা বিচারিকভাবে পর্যালোচনার একটি বিশেষ

18. কেলানতান রাজ্য এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, যেখানে হুদুদ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সীমিত আকারে এর প্রয়োগের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে ফেডারেল সংবিধানের প্রাধান্যের কারণে মালয়েশিয়ার ফেডারেল আদালত ২০২৪ সালে কেলানতানের একাধিক শরীয়া ফৌজদারি ধারাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। (*Nik Elin Zurina bt Nik Abdul Rashid & Anor v. Kerajaan Negeri Kelantan*, [2024] 3 MLRA 1; [2024] 2 MLJ 150; [2024] 3 CLJ 323; [2024] CLJU 232 (Federal Court of Malaysia).

ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এই আদালত ইসলামী নীতির আলোকে আইন সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আইন ইসলামিকরণের একটি আংশিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মডেল হিসেবে বিবেচিত।

অন্যদিকে সৌদি আরবে বিচারব্যবস্থা মূলত পূর্ণাঙ্গভাবে শরীয়াভিত্তিক, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ প্রধান আইনগত উৎস হিসেবে বিবেচিত এবং ফিকহী নীতির আলোকে বিচার-কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই মডেল একটি ভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনের ব্যাপক প্রয়োগের উদাহরণ প্রদান করে।

অনুরূপভাবে, ইরানে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে শীয়া ইমামিয়া-জাফরী ফিকহকে গ্রহণ করা হয়েছে। দেশটির সিভিল, ফৌজদারি, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ সকল আইন ও বিধান জাফরী মাযহাবের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। তবে ধর্মীয় বহুত্বের বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে সুন্নী সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে–বিশেষত কুর্দি ও বালুচ অধ্যুষিত অঞ্চলে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন (পার্সোনাল ল') বিষয়ে তাদের নিজ নিজ মাযহাব অনুসরণের সীমিত সুযোগ রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া আফগানিস্তানে রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার মৌলিক উৎস হিসেবে শরীয়া আইনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেখানে শরীয়া আইন রাষ্ট্রীয় আইনকাঠামোর সর্বাধিক প্রভাবশালী ও নিয়ামক উপাদান হিসেবে কার্যকর রয়েছে। কাতারের সংবিধান অনুযায়ী শরীয়া আইন রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের অন্যতম প্রধান উৎস; বিশেষত পারিবারিক আইন এবং নির্দিষ্ট কিছু ফৌজদারি বিধানে শরীয়ার সরাসরি প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে, ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় পর্যায়ে সিভিল আইন প্রযোজ্য থাকলেও আচেহ প্রদেশে সরকারিভাবে শরীয়া আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে; যেখানে পারিবারিক আইনের পাশাপাশি কিছু ফৌজদারি বিধানও অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের একাধিক রাজ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য শরীয়া আইন সরকারিভাবে কার্যকর রয়েছে, যেখানে হুদূদ ও কিসাসসংক্রান্ত বিধানসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুদানে শরীয়া আইন দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে এর প্রয়োগে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ ছাড়া ব্রুনাইয়ে শরীয়া আইন ধাপে ধাপে প্রবর্তন করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা নির্দিষ্ট কিছু ফৌজদারি বিধানসহ রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর রয়েছে।

উল্লিখিত অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেও ইসলামী আইন প্রয়োগের বিভিন্ন বাস্তবসম্মত রূপ ও মডেল বিদ্যমান রয়েছে। প্রেক্ষাপট, সামাজিক বাস্তবতা ও সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলে বাংলাদেশেও আইন ইসলামিকরণ একটি গ্রহণযোগ্য, কার্যকর ও টেকসই প্রক্রিয়া হিসেবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই যেমনভাবে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে

শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে এবং তা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কার এবং শরীয়া আইনের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ তার আইনব্যবস্থায় যে ব্রিটিশ কমন ল'-এর লিগ্যাসি বহন করে চলেছে, সেই কমন ল' নিজেই কোনো স্থবির বা অপরিবর্তনীয়ব্যবস্থা নয়; বরং এটি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়েধাপে ধাপে সংশোধিত, পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।[১৯] অথচ পরিতাপের বিষয়হলো, কলোনিয়াল শাসন থেকে মুক্তি লাভের পরও বাংলাদেশ এখনো বহু ক্ষেত্রে সেই ব্রিটিশ আইনগত উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে এবং গণমানুষের মূল্যবোধ, ধর্মীয়বিশ্বাস ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্বতন্ত্র ও প্রেক্ষিতনির্ভর আইনব্যবস্থা প্রণয়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

৮. আইন ইসলামিকরণে বিদ্যমান সমস্যাবলি উত্তরণের উপায়

৮.১ ধাপে ধাপে আইন সংস্কার নীতি

আইন ইসলামিকরণ একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা হঠাৎ ও একযোগে বাস্তবায়নের পরিবর্তে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করাই অধিকতর বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পর্যায়ক্রমিক আইন সংস্কারের নীতির মূল লক্ষ্য সমাজে আইনগত পরিবর্তনের প্রতি ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা সৃষ্টি করা, যাতে কাঠামোগত অস্থিরতা এবং তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইতিহাস ও ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগপদ্ধতিতেও এই বাস্তবতার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খলীফা উমর ইবনু আবদিল আযীয রাহ.-এর জীবন থেকে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি শরীয়তের কিছু বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় নিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর পুত্র আবদুল মালিক রাহ. দ্রুত সব বিধান কার্যকর করার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বলেন,

19. ইংল্যান্ডে কমন ল' প্রথমে মধ্যযুগে (১২শ থেকে ১৭শ শতক) রাজকীয়আদালতের বিচারকদের রায়ের মাধ্যমে গড়েওঠে এবং তখন এটি মূলত বিচারিক নজিরনির্ভর ছিল; পরবর্তীতে ১৯শ শতকে শিল্পবিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে এতে বড়ধরনের কাঠামোগত সংস্কার আসে, বিশেষ করে ১৮৭৩-১৮৭৫ সালের Judicature Acts-এর মাধ্যমে কমন ল' ও ইক্যুইটি আদালত একীভূত হয়ে বিচার প্রক্রিয়া সহজ ও সমন্বিত হয়; একই শতক ও পরবর্তী ২০শ শতকে শ্রম, শিল্প, নারী ও শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংসদীয় আইন প্রণীত হওয়ায় বহু কমন ল' নীতি সংশোধিত বা সীমাবদ্ধ হয়; এরপর ২০শ শতকের শেষভাগে Human Rights Act, 1998 কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার মানদণ্ডের আলোকে কমন ল' নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ শুরু হয়; সর্বশেষ ২১শ শতকে প্রযুক্তি, তথ্য সুরক্ষা ও ডিজিটাল অধিকারসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ফলে কমন ল' আরও আধুনিক রূপ লাভ করে এবং ক্রমশ বিধিবদ্ধ আইনের অধীন হয়েপড়ে।

لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة.

হে স্নেহের পুত্র! তাড়াহুড়া করো না! কারণ, আল্লাহ তাআলাও কুরআনেও প্রথম দুবার মদের নিন্দা করেছেন, আর তৃতীয়বারে তা হারাম করেছেন। আমার আশঙ্কা হয়, যদি আমি মানুষকে একসাথে সকল সত্য মেনে চলতে বাধ্য করি, তবে তারা একযোগে তা প্রত্যাখ্যান করবে আর এতে ফিতনা সৃষ্টি হবে।[২০]

তাঁর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমিকতা কেবল একটি কৌশলই নয়; বরং শরীয়ত প্রণয়নের একটি অন্তর্নিহিত নীতিও।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মতের ওপর আল্লাহ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ তিনি শরীয়তের সকল বিধান একসঙ্গে অবতীর্ণ করেননি; বরং ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে বিধানসমূহ নাযিল করেছেন। বহু বিষয়ের চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর না করে মানুষের মানসিক প্রস্তুতি ও সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে ক্রমান্বয়ে জারি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের আবির্ভাবকালে মদ্যপান ও ব্যভিচার আরব সমাজে এবং বরং তৎকালীন বিশ্বে সাধারণ সামাজিক আচরণ হিসেবে প্রচলিত ছিল এবং এগুলোকে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হতো না। অথচ ইসলাম এসব কর্মকে গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলাম ধীর ও পর্যায়ক্রমিক পন্থা অবলম্বন করেছে। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা)-এর বর্ণনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

..إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا..

.. কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে মুফাস্সাল সূরাও ছিল, যেখানে কেবল জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। এরপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলো তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। যদি শুরুতেই নাযিল হতো যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে তারা অবশ্যই বলতো যে, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করবো না। যদি শুরুতেই নাযিল হতো যে, তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা অবশ্যই বলতো যে, আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করবো না।...[২১]

20. Shātibī. Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaaāt.* Bavrūt: Dār Ibn 'Affān. 1997. 2:148
21. Bukhārī. *Al-Jāmi' as-Sahīh.* Hadith No.: 4707: Nasā'ī. Ahmad. *As-Sunan al-Kubrā.* Hadith No.: 7987. 11558; 'Abd al-Razzāq aṣ-Ṣan'ānī. *Al-Muṣannaf.* Hadith No.: 5943

এই বর্ণনা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া একটি মৌলিক নীতি।

একই নীতির প্রতিফলন দেখা যায় ছকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাতেও। সাইয়িদুনা উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তারা কিছু শর্ত আরোপ করে 'তাদের যুদ্ধেও আমন্ত্রণ জানানো হবে না, তাদের থেকে সম্পদের দশমাংশ (বা যাকাত)-ও সংগ্রহ করা হবে না এবং তাদের নামায পড়তেও বলা হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের শর্তগুলো প্রায়ই মেনে নিয়ে বলেন,

لكم أن لا تُحشَروا ولا تُعشَروا، ولا خيرَ في دِين ليس فيه ركوعٌ.

> তোমাদের জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, তোমাদেরকে যুদ্ধেও আমন্ত্রণ জানানো হবে না এবং তোমাদের থেকে সম্পদের দশমাংশ (বা যাকাত)-ও গ্রহণ করা হবে না; তবে সেই দীনের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যেখানে কোনো রুকূ' নেই।[২২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর অচিরেই যাকাতও আদায় করবে এবং জিহাদেও অংশ নেবে।[২৩] বাস্তবে তাই ঘটেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা অত্যন্ত খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলিমে পরিণত হন, যার সাক্ষ্য সাহাবা-ই-কিরাম দিয়েছেন।[২৪]

এ ঘটনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানুষের মানসিক প্রস্তুতি, সামাজিক বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে বিবেচনায় রেখে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই সর্বাধিক ফলপ্রসু পন্থা।

এই নীতির আলোকে আইন সংস্কারের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। প্রাথমিত ধাপে পারিবারিক আইন, অতঃপর সিভিল আইন, আর্থিক আইন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আইনসমূহকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। যেহেতু এসব আইন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, তাই এসব ক্ষেত্রে ন্যায়, ভারসাম্য ও কল্যাণের বাস্তব প্রতিফলন ঘটলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা ও আস্থা তৈরি হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই অর্জিত আস্থা, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির ভিত্তিতে প্রশাসনিক আইন, ফৌজদারি আইন এবং নীতি-নির্ধারণমূলক কাঠামোতে ধাপে ধাপে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হলে একদিকে যেমন ইসলামী আইনচিন্তার মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়া) অক্ষুণ্ন থাকবে, অন্যদিকে সমাজের বাস্তবতা,

22. Abū Dāwūd, Sulaymān. *As-Sunan.* Hadith No.: 3028.
23. Abū Dāwūd, Sulaymān. *As-Sunan.* Hadith No.: 3027; nv`xmwU mnxn|
24. Ibn Sa'd. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā.* Bayrūt: Dār Ṣādir, n.d., 1: 314.

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং আইনি ধারাবাহিকতার প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভব হয়।

৮.২ সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির সমন্বয়

আইন ইসলামিকরণের বাস্তবসম্মত উত্তরণের ক্ষেত্রে সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যেহেতু সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্দেশক আইন এবং আইন প্রণয়ন, শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করে, সেহেতু বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী আইনচিন্তার প্রয়োগ সংবিধানিক কাঠামোর ভেতরেই বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। তাত্ত্বিকভাবে এই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত হলেও বাস্তবে এটি একটি সূক্ষ্ম, ধৈর্যসাপেক্ষ ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া; বিশেষত গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংসদীয় ব্যবস্থার ভেতরে এই সমন্বয় সাধন করতে গেলে নানাবিধ রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের কেন্দ্রবিন্দু হলো সংসদ। ফলে সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির কার্যকর সমন্বয় বাস্তবায়নের একটি মৌলিক পূর্বশর্তই হচ্ছে সংসদে ইসলামী আইনচিন্তা, ন্যায়নীতি ও মাকাসিদুশ শরীয়ার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ প্রতিনিধিদের উল্লেখযোগ্য, দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এই প্রতিনিধিত্ব কেবল সংখ্যাগত সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন সম্ভব নয়; বরং সংসদীয় রীতি, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, কমিটি ব্যবস্থা এবং সংবিধানিক সীমারেখা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে তা কার্যকর রূপ লাভ করবে। কারণ, সংসদে যোগ্য প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ইসলামী আইন সংস্কার আলোচনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয় না এবং সংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে নীতিগত পরিবর্তনের পথও সুগম হয় না।

উল্লেখ্য, সংসদে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের উপস্থিতি একটি অপরিহার্য শর্ত হলেও একে এককভাবে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে গণ্য করা যায় না। সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির সমন্বয় যদি কোনো একক রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর এজেন্ডা হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তবে তা অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক বিরোধ, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এ বাস্তবতায় সমন্বয় প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক ধাপ হওয়া উচিত সংসদীয় পর্যায়ে বহুদলীয় আলোচনা ও নীতিগত সংলাপের মাধ্যমে বিস্তৃত নীতিগত ঐকমত্য গড়ে তোলা। এই সংলাপে ইসলামী ন্যায়নীতি, মানবিকতা ও সামাজিক কল্যাণের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোকে দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে একটি নৈতিক ও মানবকেন্দ্রিক কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিষয়টিকে 'ধর্মীয় আধিপত্য' বা নির্দিষ্ট আদর্শিক প্রয়াস হিসেবে নয়; বরং বিদ্যমান আইনব্যবস্থার নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক মর্যাদা সুদৃঢ়করণের একটি সংস্কারমূলক উদ্যোগ হিসেবে ফ্রেম করা

হলে সংসদীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থার ভিত্তিতে একটি কার্যকর নীতিগত ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একই ধারাবাহিকতায়, সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির মধ্যে বিরোধ নয়; বরং একটি সমন্বয়মূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা আবশ্যক। এ প্রক্রিয়ায় সংবিধানের মৌলিক চেতনা ও মৌলিক অধিকারসমূহের আলোকে বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনা করে নির্ণয় করতে হবে–কোন কোন আইন ইসলামের মৌলিক নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সংশোধনের লক্ষ্য হবে সংবিধানকে অকার্যকর করা নয়; বরং ইসলামী আইনের মৌলিক উদ্দেশ্যের (মাকাসিদুশ শরীয়া–যেমন জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি, সম্পদ, বংশ ও মানবিক মর্যাদার সুরক্ষা) সঙ্গে আধুনিক সাংবিধানিক নীতির একটি যৌক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করে আইনসমূহকে আরও ন্যায়সঙ্গত, মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এর ফলে আইন সংস্কার প্রক্রিয়া কেবল ধর্মীয় আদর্শের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, যুক্তিনির্ভর ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়; যেখানে একদিকে রাষ্ট্রের আইনগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, অন্যদিকে ইসলামী ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়।

৮.৩ জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন গঠন

আইন ইসলামিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক, পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের 'ইসলামিক আইন কমিশন' গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই ধরনের একটি কমিশন যদি প্রজ্ঞাবান আলেম, আধুনিক আইনবিদ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তবে তা বহুমাত্রিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হবে বিদ্যমান আইনসমূহকে ইসলামী আইনচিন্তার মৌলিক নীতি, মাকাসিদুশ শরীয়া এবং সংবিধানিক কাঠামোর আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা। একই সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমসাময়িক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আইন সংস্কারের ধাপে ধাপে রূপরেখা প্রণয়ন করাও এ কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ প্রস্তাবিত আইন সংস্কারের সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়ক হবে, আর আইনবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এসব সংস্কারের আইনি বৈধতা, সাংবিধানিক সামঞ্জস্য ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত একটি জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে গবেষণা, জনপরামর্শ ও তুলনামূলক আইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিগত ও সংস্কারমূলক সুপারিশ প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে। এর ফলে আইন ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া আবেগনির্ভর বা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে একটি সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পথে অগ্রসর হতে পারবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রে আইনের শরীয়া-সম্মততা যাচাই ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে, যা প্রস্তাবিত 'জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন' ধারণার বাস্তব ও কার্যকর ভিত্তি নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Council of Islamic Ideology (CII) রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইনসমূহকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা করে সরকার ও সংসদকে সংশোধনীমূলক সুপারিশ প্রদান করে থাকে; পাশাপাশি ফেডারেল শরীয়া কোর্ট বিচারিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে কোনো আইন শরীয়া-পরিপন্থী কি না–তা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ দেয়। অনুরূপভাবে, ইন্দোনেশিয়ায় Majelis Ulama Indonesia (MUI) জাতীয় পর্যায়ের উলামা পরিষদ হিসেবে ফিকহ-ভিত্তিক মতামত ও নীতিগত পরামর্শ প্রদান করে রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওআইসির International Islamic Fiqh Academy সমসাময়িক আইনি ও সামাজিক ইস্যুতে মাকাসিদুশ শরীয়াভিত্তিক গবেষণা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আইন সংস্কার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে থাকে।

এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, ফকীহ, আইনবিদ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন, গবেষণাভিত্তিক ও পরামর্শমূলক জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন আইন ইসলামিকরণকে আবেগনির্ভর উদ্যোগের পরিবর্তে একটি সুসংহত, যুক্তিনির্ভর ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় রূপ দিতে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.৪ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা জোরদার

আইন ইসলামিকরণের প্রক্রিয়াকে টেকসই, যুক্তিনির্ভর ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান অপরিহার্য। কারণ, যথাযথ একাডেমিক প্রস্তুতি ও জ্ঞান ছাড়া আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত অথবা স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী আইন (ফিকহ) ও তুলনামূলক আইন বিশ্লেষণ বিষয়ে গভীর ও পদ্ধতিগত গবেষণা, নিয়মিত একাডেমিক সেমিনার এবং বিশেষায়িত কোর্স চালু করা হলে একটি সুদৃঢ় ও বহুমাত্রিক জ্ঞানভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। বিশেষত তুলনামূলক আইন অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আইনব্যবস্থা, ইসলামী আইনের আধুনিক প্রয়োগ এবং সংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে তার সমন্বয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে গবেষণাভিত্তিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। এ ছাড়া একাডেমিক সেমিনার, কর্মশালা ও গবেষণা সংলাপ আলিম, আইনজ্ঞ ও গবেষকদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়কে গতিশীল ও ফলপ্রসু করে তোলে, যা জ্ঞান উৎপাদন ও নীতিগত চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই ধরনের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রিক উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে এমন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলে, যারা ইসলামী ন্যায়নীতি, সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক আইনব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে আইন সংস্কারের প্রক্রিয়ায় কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ফলে আইন ইসলামিকরণ কেবল একটি তাত্ত্বিক বা আবেগনির্ভর প্রচেষ্টা না হয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক, জ্ঞাননির্ভর ও একাডেমিকভাবে সুসংহত প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করতে পারে।

এরূপ প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ইতোমধ্যে উচ্চশিক্ষা ও একাডেমিক গবেষণাকে কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, টেকসই আইন সংস্কারের জন্য কেবল আবেগ বা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, একাডেমিক প্রস্তুতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অপরিহার্য।

এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। International Islamic University Malaysia (IIUM)-এ ইসলামী আইন ও কমন ল'-এর সমন্বিত পাঠক্রম দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। এখানে Comparative Law, Islamic Jurisprudence এবং Constitutional Studies-এর ওপর গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শরীয়া ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করে। এর ফলস্বরূপ মালয়েশিয়ায় শরীয়া কোর্ট ও সিভিল কোর্টের এখতিয়ার, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমন্বয় বিষয়ে একাডেমিকভাবে দক্ষ ও বাস্তবমুখী আইনজ্ঞ তৈরি হয়েছে, যা দেশটির দ্বৈত আইনব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাকিস্তানে International Islamic University Islamabad এবং Federal Shariat Court-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী আইন, সংবিধান ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নিয়মিত গবেষণা, সেমিনার ও একাডেমিক আলোচনার আয়োজন করে থাকে। এসব গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ আইন সংস্কার ও বিচারিক পর্যালোচনায় বাস্তব ভূমিকা রাখছে।

সৌদি আরবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং সমসাময়িক আইনগত সমস্যার ওপর গবেষণার ঐতিহ্য বিদ্যমান। জামিয়া উম্মুল কুরা ও জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা-এর মতো প্রতিষ্ঠানে শরীয়াভিত্তিক গবেষণাকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যার প্রতিফলন বিচারিক সিদ্ধান্ত ও আইনগত ব্যাখ্যায় লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে মরক্কো ও তিউনিসিয়াতে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী আইন, সমাজবিজ্ঞান ও মানবাধিকার অধ্যয়নের সমন্বিত পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে পারিবারিক আইন ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় ধাপে ধাপে সংস্কার আনা সম্ভব হয়েছে, যা মূলত একাডেমিক গবেষণা ও সমাজবাস্তবতার সমন্বিত বিশ্লেষণের ফল হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক সময়ে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এ আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ চালু হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ। এ বিভাগে ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, ইসলামী আইন এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় ও সংবিধানিক আইনের মৌলিক ধারণাসমূহকে সমন্বিতভাবে পাঠদানের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে শরীয়াভিত্তিক আইনচিন্তায় দক্ষতা অর্জন করছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনব্যবস্থা ও বিচারিক কাঠামোর সঙ্গে ইসলামী আইনের সম্পর্ক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ ধরনের একাডেমিক উদ্যোগ ভবিষ্যতে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনে গবেষক, আইনজ্ঞ ও নীতিনির্ধারক তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এ পাঠক্রম যদি আরও গবেষণামুখী ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিস্তৃত করা যায়, তবে তা বাংলাদেশের আইনব্যবস্থায় ইসলামী আইন প্রয়োগ ও সংস্কারসংক্রান্ত আলোচনাকে একটি সুদৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রদান করতে সক্ষম হবে।

উপর্যুক্ত সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে উপেক্ষা করে আইন ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াকে টেকসই ও কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন। বরং গবেষণা, তুলনামূলক আইন অধ্যয়ন এবং ধারাবাহিক একাডেমিক সংলাপের মাধ্যমে গড়ে ওঠা জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদই ইসলামী ন্যায়নীতি, সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ আইন সংস্কারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ফলে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এই বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে যে, আইন ইসলামিকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি, গবেষণানির্ভর ও উচ্চশিক্ষাভিত্তিক প্রক্রিয়া; যা শক্তিশালী একাডেমিক অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছাড়া কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৮.৫ জনসচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ

আইন ইসলামিকরণের প্রক্রিয়াকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করতে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ জোরদার করা বাস্তব পর্যায়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ইসলামী আইনের ন্যায়নীতি, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক কল্যাণমূলক দিকগুলো নিয়ে সেমিনার, কর্মশালা কিংবা পাঠক্রম চালু করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর ও সমালোচনামূলক উপলব্ধি তৈরি হয়। এর ফলে ইসলামী আইনকে কেবল ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যভিত্তিক আইনি দর্শন হিসেবে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে জনসচেতনতা গঠনে সহায়ক।

একই সঙ্গে গণমাধ্যম, বিশেষত অনলাইন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইসলামী আইন সম্পর্কে ইতিবাচক ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

টকশো, প্রামাণ্যচিত্র কিংবা বিশ্লেষণধর্মী লেখায় ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগসংক্রান্ত কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হলে আবেগনির্ভর বিতর্কের পরিবর্তে তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা গড়ে ওঠে। এতে ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রচলিত ভীতি, ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি হ্রাস পায় এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ধর্মীয় বয়ানের ক্ষেত্রেও সচেতন ও দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা অপরিহার্য। খুতবা, ওয়াজ ও ধর্মীয় আলোচনায় শাস্তিমূলক দিকের অতিরঞ্জিত উপস্থাপনার পরিবর্তে ইসলামী আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য–যেমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুবিচার, দুর্বল শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ এবং মানবিক মর্যাদা আলোচিত হলে জনমানসে আস্থা সৃষ্টি হয়। এতে ধর্মীয় বয়ান আবেগনির্ভর না হয়ে নৈতিকতা ও মানবকল্যাণকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে, যা সমাজের বৃহত্তর অংশকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের ক্ষেত্রে ভিন্নমত ও সমালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একাডেমিক ও গবেষণা ফোরামে ইসলামি চিন্তাবিদ, আইনজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনা আয়োজন করা হলে আইন ইসলামিকরণ কোনো একমুখী বা চাপিয়ে দেওয়া প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিভাত হয় না। বরং এটি পরামর্শনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক ও যুক্তিসম্মত উদ্যোগে রূপ নেয়, যা গণতান্ত্রিক মনোভাব ও সামাজিক ঐকমত্য গঠনে সহায়ক।

এ ছাড়া অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহজ ভাষায় লেখা নিবন্ধ, প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা কিংবা ইনফোগ্রাফিকের মাধ্যমে ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের পরিসর বিস্তৃত হয় এবং আলোচনাটি একাডেমিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের বৃহত্তর স্তরে পৌঁছায়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, যখন জনসচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক কল্যাণের ভাষায় পরিচালিত হয়, তখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ইসলামী আইনকে কেবল ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবে নয়; বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী নৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এতে আইন ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও টেকসই ভিত্তি লাভ করে।

৮.৬ ফিকহী ব্যাখ্যা ও গবেষণাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন

আইন ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের একটি বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ উপায় হলো ফিকহী ব্যাখ্যা ও গবেষণাগুলোর মধ্যে সুসংগঠিত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন। ইসলামী আইনশাস্ত্রের বহুমাত্রিকতা ও মাযহাবভিত্তিক বৈচিত্র্য একদিকে যেমন ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা কখনো কখনো জটিলতা সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা বিভিন্ন মাযহাব ও সমসাময়িক ফিকহী

গবেষণার মধ্যকার মতভেদকে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত সিদ্ধান্তে রূপ দিতে সক্ষম হবে।

এই লক্ষ্যে সকল মাযহাবের খ্যাতনামা ও যোগ্য ফকীহদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের শক্তিশালী ফিকহ বোর্ড বা ফিকহ কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। উক্ত বোর্ড গভীর গবেষণা, দলীলভিত্তিক আলোচনা ও সমকালীন বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে হয়তো একটি অভিন্ন সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করবে, অথবা একাধিক গ্রহণযোগ্য মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রাষ্ট্রীয় আইনের উপযোগী রূপ নির্ধারণ করবে। এ ধরনের সমন্বয়মূলক উদ্যোগ ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিসমূহ অক্ষুণ্ন রেখেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চাহিদা পূরণে সহায়ক হতে পারে।

ইতিহাসে এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উসমানী খিলাফতের আমলে। তুরস্কে ১২৮৬ হিজরী (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) হানাফী ফকীহদের মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে সিভিল ল' বিষয়ক একটি বিধিবদ্ধ সংকলন প্রণীত হয়, যা مجلة الأحكام العدلية (মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ) নামে পরিচিত। এ সংকলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল– প্রতিটি বিষয়ে বহু মতের পরিবর্তে কেবল অগ্রাধিকারযোগ্য মতটিকে আইনরূপে লিপিবদ্ধ করা। যদিও গ্রন্থটি মূলত ফিকহে হানাফীর ভিত্তিতে রচিত, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে হানাফী মাযহাবের বাইরের মত গ্রহণ করা হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার মাযহাবের বাইরের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংকলনটি প্রণীত হওয়ার পর ১২৯৩ হিজরীতে খলীফা একে রাষ্ট্রীয় আইনগ্রন্থ হিসেবে অনুমোদন দেন এবং উসমানী খিলাফতের অধীন সকল অঞ্চলে তা কার্যকর করা হয়।

একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পার্সোনাল ল' বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধিবদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়, যার নাম قانون حقوق العائلة العثمانية (অটোমান পারিবারিক আইন)। এ আইনে বিয়ে, তালাক ও পারিবারিক সম্পর্কসংক্রান্ত বিধানসমূহ প্রধানত হানাফী মাযহাবের আলোকে আইনগত কাঠামোয় বিন্যস্ত করা হলেও বাস্তব প্রয়োজন ও সামাজিক কল্যাণের বিবেচনায় কোনো কোনো মাসআলায় অন্যান্য মাযহাবের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৩৩৫ হিজরীতে প্রণীত এ আইনটি সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩৭২ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এ অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেও প্রয়োজনে অন্যান্য মাযহাবের সহায়ক মত অন্তর্ভুক্ত করা রাষ্ট্রীয় আইনের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগেও ফিকহী ব্যাখ্যা ও গবেষণার সমন্বয়ের সফল প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিশেষত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রীয় বা আধা-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফিকহী কাউন্সিল ও শরীয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমন্বয় একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মিসরের দারুল ইফতা ও আল-আযহার-কেন্দ্রিক ফিকহী গবেষণা কাঠামো। এখানে বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহ ও গবেষকগণ ব্যাংকিং, বীমা, চিকিৎসা নৈতিকতা, পরিবার ও উত্তরাধিকার আইনসহ সমকালীন ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে গবেষণা (Collective

Ijtihad) পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব গবেষণালব্ধ সুপারিশ গ্রহণের সময় শরীয়ার উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়া), জনকল্যাণ এবং সমকালীন বাস্তবতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় পাকিস্তানের Council of Islamic Ideology-এর কার্যক্রমে। এ কাউন্সিল বিভিন্ন ফিকহী মতামত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা–সে বিষয়ে সরকার ও সংসদকে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের প্রতি একচেটিয়া আনুগত্যের পরিবর্তে দলীলের শক্তি, জনস্বার্থ (মাসলাহাহ) এবং সময় ও সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের আলোকে মতামত গ্রহণ করা হয়। ফলে এ কাউন্সিল ফিকহী মতভেদের মধ্যে গঠনমূলক সমন্বয় সাধনের একটি বাস্তব ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এ ধরনের সমন্বিত প্রয়াস লক্ষণীয়। ওআইসির অধীন ইসলামী ফিকহ একাডেমি এবং রাবিতা আল-আলাম আল-ইসলামীর ফিকহ কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন মাযহাবের আলিমগণ একত্রিত হয়ে সমসাময়িক জটিল সমস্যাসমূহের ওপর যৌথ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এসব সিদ্ধান্তে বহুমাত্রিক ফিকহী মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন একটি সমন্বিত অবস্থান নির্ধারণ করা হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো সাংবিধানিক ফিকহী কাউন্সিল বিদ্যমান না থাকলেও, বেসরকারি ও গবেষণামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে ফিকহী সমন্বয় ও ইসলামী আইনচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার**। প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী আইন, পারিবারিক আইন, মানবাধিকার ও সমকালীন আইনগত সমস্যাসমূহ নিয়ে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি শরীয়াভিত্তিক আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকে। একই সঙ্গে তারা ফিকহী মতামতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে ইসলামী আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ ধরনের বেসরকারি গবেষণা ও লিগ্যাল এইডভিত্তিক উদ্যোগ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ফিকহী কাউন্সিল গঠনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের ফিকহ বোর্ড ও কাউন্সিলের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, যদি বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণালব্ধ সুপারিশসমূহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অধিকতর গুরুত্ব পায়, তবে ফিকহী বৈচিত্র্যকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন রচনা করা সম্ভব হবে।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ও আধুনিক অভিজ্ঞতাসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ফিকহী বৈচিত্র্য কোনো দুর্বলতা নয়; বরং সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গবেষণাভিত্তিক

সমন্বয়ের মাধ্যমে তা রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সম্পদে পরিণত হতে পারে। অতএব, বর্তমান যুগে আইন ইসলামিকরণের প্রয়াসে ফিকহী মতভেদকে উপেক্ষা না করে বরং সেগুলোর মধ্যে দলীলভিত্তিক, সময়োপযোগী ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধনকে একটি অপরিহার্য কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

৯. সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ

আইন ইসলামিকরণ প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হয়–বহুধর্মীয় ও বহুজাতিক সমাজে এই প্রক্রিয়া কি ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শামিল? এ প্রশ্নের উত্তরে নৈতিক ও আইনগত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আইন ইসলামিকরণ অনিবার্যভাবে কোনো ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া নয়; একইভাবে এটি কোনো একক বিশ্বাসব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কৌশলও নয়। বরং ইসলামী আইনচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এই নৈতিক-আইনগত কাঠামোর অন্তর্গত একটি মৌলিক নীতি হলো–সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা, যা কেবল নৈতিক কর্তব্যই নয়; বরং একটি শারয়ী দায়িত্ব হিসেবেও স্বীকৃত।

এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হলো মদীনা সনদ। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক চুক্তিই নয়; বরং একটি বহুধর্মীয় ও বহুজাতিক সমাজে পারস্পরিক অধিকার, নাগরিক নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি প্রামাণ্য দলীল। মদীনা সনদে মুসলিম, ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রসমূহকে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এই দলীল প্রমাণ করে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা তার সূচনালগ্ন থেকেই বহুত্ববাদী বাস্তবতার সঙ্গে সহাবস্থানের নীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

পরবর্তী যুগে খুলাফা-ই-রাশিদীনের শাসনামলে এই নীতির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়। বিশেষত আমীরুল মুমিনীন উমর রা. কর্তৃক জেরুজালেম বিজয়ের পর প্রণীত আহদনামা-ই-উমরী (Covenant of Umar) সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয়, ধর্মচর্চা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং তাদের ওপর কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।[২৫] এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থায় মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

---

25. Ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997. 4: 448-451

এছাড়াও উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে, এমনকি পরবর্তী অটোমান শাসনামলেও সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক আইনগত ও সামাজিক পরিসর বজায় রাখার নজির দেখা যায়। বিশেষভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের মিল্লাত ব্যবস্থা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করেছিল। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে ব্যক্তিগত আইন, শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) ও বাস্তববাদী চরিত্রকে প্রতিফলিত করে।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আইন ও নৈতিকতার সমন্বয় কেবল তাত্ত্বিক আদর্শে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা বাস্তব প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই কার্যকর হয়েছিল। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইন তার মৌলিক দর্শনে সহাবস্থান, ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং বহুধর্মীয় সমাজে মানবাধিকার সংরক্ষণে একটি কার্যকর ও নৈতিক কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম।

১০. বাংলাদেশে শরীয়া আইন কার্যকরকরণ : বাস্তবতা ও সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে শরীয়া আইন কার্যকরকরণের প্রশ্নটি মূলত দুটি ভিন্ন মাত্রায় আলোচনা করা যেতে পারে–

ক. পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন বাস্তবায়ন; এবং

খ. আংশিক বা ধাপে ধাপে শরীয়া আইন বাস্তবায়ন।

এই দুই পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতায় প্রভাব ও পরিণতি ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন বাস্তবায়ন সাধারণত একটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের একমাত্র ও সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উদাহরণ হিসেবে সৌদি আরব, ইরান এবং আফগানিস্তান-এর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। সৌদি আরবে লিখিত সংবিধানের পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্রের মূল আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; ইরানে বিপ্লবোত্তর সংবিধানে 'বিলায়াতুল ফকীহ' নীতির (Doctrine of Wilayat al-Faqih)-এর মাধ্যমে শরীয়া আইনকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে; এবং বর্তমানে আফগানিস্তানে শরীয়াকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে ঘোষণা করে সিভিল আইনের প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন প্রয়োগ সাধারণত সংবিধান পুনর্লিখন কিংবা রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোগত রূপান্তর ব্যতীত সম্ভব নয়।

এ ধরনের ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন কর্তৃত্ব মূলত ধর্মীয় উৎস ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে ন্যস্ত থাকে। সৌদি আরবে বিচারকরা সরাসরি ফিকহভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন; ইরানে সংসদে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে গার্ডিয়ান কাউন্সিল কর্তৃক তা

অনুমোদিত হতে হয়; এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় ব্যাখ্যাই কার্যত আইন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব হয় সীমিত, নয়তো অকার্যকর।

এ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ শরীয়া ব্যবস্থায় আদালত কাঠামো সাধারণত একক ও শরীয়াভিত্তিক হয়। সৌদি আরব ও আফগানিস্তানে সিভিল ও শরীয়া আদালতের পৃথক অস্তিত্ব নেই; বরং সকল আদালতই শরীয়া আদালত হিসেবে কাজ করে। ইরানে বিভিন্ন স্তরের আদালত বিদ্যমান থাকলেও সেগুলো শরীয়ার সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধানের অধীন। একই সঙ্গে ফৌজদারি আইনে হুদূদ, কিসাস ও তাযীর শাস্তির বিধান কার্যকর থাকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ শরীয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠন সাধিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় একটি সীমিত পরিসরে শরীয়া বিধান প্রয়োগকারী রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। এই বাস্তবতার আলোকে, উপর্যুক্ত পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের একটি মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আইনের একমাত্র মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃত নয়; বরং সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রণীত সংবিধানই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন হিসেবে কার্যকর রয়েছে। ফলে পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন বাস্তবায়নের প্রশ্নটি এখানে কেবল সীমিত আইনগত সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; বরং তা রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ক্ষমতার উৎস এবং সাংবিধানিক দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি জটিল রূপান্তরের বিষয় হয়ে ওঠে।

এই বাস্তবতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের বিদ্যমান শরীয়া আইন ও শরীয়া আদালতসংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা ও বিচার কাঠামোর ইসলামিকরণ এককালীন প্রয়াসের মাধ্যমে নয়; বরং ধাপে ধাপে, এবং সংবিধানসম্মত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরভাবে অগ্রসর হতে পারে।

ধাপে ধাপে আইন ইসলামিকরণের কাঠামো

প্রথম ধাপ: সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারণ ও নীতিগত স্বীকৃতি

ইসলামিকরণের প্রক্রিয়ার সূচনালগ্নে সংবিধান সংশোধন বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামী আইনের ভূমিকা, প্রয়োগক্ষেত্র ও সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা অপরিহার্য। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো, মৌলিক অধিকার ও ক্ষমতার ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রেখে শরীয়া আইনের একটি নির্দিষ্ট ও সুসংজ্ঞায়িত অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে ফেডারেল শরীয়া আদালত প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা নির্দেশ করে–কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে শরীয়াভিত্তিক বিচারিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় ধাপঃ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন সংস্কার

এই ধাপে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন–বিশেষত বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও ধর্মীয় আচরণসংক্রান্ত বিধানবিদ্যমান মুসলিম পারিবারিক আইনের কাঠামোর মধ্যেই শরীয়া নীতির সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংস্কার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার রাজ্যভিত্তিক শরীয়া আদালত ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা একটি কার্যকর তুলনামূলক মডেল, যেখানে সিভিল আইনব্যবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান বজায় রেখে শরীয়া আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞদের মতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের একটি সমন্বিত সংহতিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যমান অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, 'নাতি-নাতনির উত্তরাধিকার' বা নারীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত বির্তকিত বিষয়ে আইনের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে শরীয়ার মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে গবেষক ড. মোহাম্মদ মানজুরে-ইলাহী ইতোমধ্যে তাঁর "মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর উত্তরাধিকার : ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করণীয় তুলে ধরেছেন।[২৬]

তৃতীয় ধাপঃ সিভিল আইন সংস্কার

আইন ইসলামিকরণের একটি কেন্দ্রীয় ও সংবেদনশীল ধাপ হিসেবে সিভিল আইন–বিশেষত চুক্তি আইন, সম্পত্তি আইন, ক্ষতিপূরণ আইন, দেওয়ানি দায় ও অধিকারসংক্রান্ত বিধানশরীয়া নীতির আলোকে পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা ও সংস্কার করা যেতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য কোনো আকস্মিক বা সর্বাত্মক রূপান্তর নয়; বরং ন্যায়, নৈতিকতা, প্রতারণা প্রতিরোধ, পারস্পরিক সম্মতি ও দায়বদ্ধতার মতো শরীয়া-সমর্থিত মৌলিক নীতিগুলোকে বিদ্যমান সিভিল আইনের সঙ্গে ধীরে ধীরে অভিযোজিত করা। এই ধাপটি পারিবারিক আইন ও অর্থনৈতিক আইনের মধ্যবর্তী একটি সেতুবন্ধনমূলক পর্যায় হিসেবে কাজ করবে।

চতুর্থ ধাপঃ অর্থনৈতিক ও আর্থিক আইন সংস্কার

এ ধাপে আইন ইসলামিকরণের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক ও আর্থিক আইন–বিশেষত ব্যাংকিং, বীমা, বিনিয়োগ, করব্যবস্থা এবং আর্থিক লেনদেনসংক্রান্ত আইনসমূহ শরীয়া নীতির আলোকে পর্যালোচনা ও সংস্কার করা যেতে পারে। এই পর্যায়ে সুদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থার নীতি, ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং ন্যায়ভিত্তিক লেনদেনের

26. Dr. Moham'mad Manajure-ilahi, "Musalim pāribārik ā'in adhyādēś 1961' ē pautra-pautrī and dauhitra-dauhitrīra uttarādhikār: Islāmī śarīẏāh bhittik ēkaṭi paryālōcanā", *Islami Ain O Bichar Journal,* 2005, Vol. 2, Issue. 4, P. 72-83, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sScQppgAAAAJ&cstart=200&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=sScQppgAAAAJ:LPtt_HFRSbwC

ধারণাকে বিদ্যমান আর্থিক আইনের সঙ্গে ধাপে ধাপে অভিযোজিত করার সুযোগ রয়েছে। এতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে।

পঞ্চম ধাপঃ সীমিত এখতিয়ারসম্পন্ন শরীয়া বিচারিক কাঠামো

এ ধাপে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ায় সীমিত এখতিয়ারসম্পন্ন বিশেষায়িত শরীয়া আদালত অথবা সিভিল আদালতের অধীনে শরীয়া বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এসব আদালত বা বেঞ্চ কেবল মুসলিম নাগরিকদের নির্দিষ্ট পারিবারিক, সিভিল ও আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করবে, ফলে জাতীয় সিভিল আদালতের একক কর্তৃত্ব ও সামগ্রিক বিচারিক ঐক্য অক্ষুণ্ন থাকবে।

ষষ্ঠ ধাপঃ মানবাধিকার ও বহুত্ববাদী বাস্তবতার সুরক্ষা

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রতিটি ধাপে মানবাধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার এবং বহুত্ববাদী সামাজিক বাস্তবতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াই হবে এই সীমিত ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক শর্ত। ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে সীমিত আকারে শরীয়া আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে থেকেও ধর্মীয় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈচিত্র্য ও নাগরিক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

সপ্তম ও সর্বশেষ ধাপঃ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

সবশেষে বিচারক, আইনজীবী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামী আইন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শরীয়া আইন প্রয়োগ একটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না হয়ে একটি সুসংহত, গবেষণাভিত্তিক ও নীতিনির্ভর আইন সংস্কার প্রক্রিয়ায় রূপ নেবে।

১১. শরীয়া ফৌজদারি আইন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাঃ সংযত ও পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন কাঠামো

অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফৌজদারি আইন ইসলামিকরণ কোনো তাৎক্ষণিক বা একমাত্রিক আইন সংস্কার প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত একটি সংবেদনশীল, বহুস্তরবিশিষ্ট এবং দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তর প্রক্রিয়া।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতো একটি সংবিধান দ্বারা শাসিত, সংসদীয় সার্বভৌমত্বসম্পন্ন ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্রে শরীয়া ফৌজদারি আইন–বিশেষত হুদূদ, কিসাস ও তাযীর বাস্তবায়নকে আংশিক বা সীমিত ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার সূচনাবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা বাস্তবসম্মত নয়। এর প্রধান কারণ হলো ফৌজদারি আইন সরাসরি নাগরিকের জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শারীরিক নিরাপত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে; ফলে এ ক্ষেত্রে যেকোনো অসংযত বা অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত আইনগত পরিবর্তন

অনিবার্যভাবে সংবিধানে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত মৌলিক অধিকারগুলোর সীমা, সুরক্ষা ও কাঠামোর সঙ্গে গভীর সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে।

উপরন্তু, ইসলামী শরীয়ত নিজেই ফৌজদারি বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা, সংযম ও কঠোর প্রমাণনীতির ওপর জোর দিয়েছে দিয়েছে। বিশেষত হুদুদের ক্ষেত্রে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলে শাস্তি কার্যকর করার অনুমতি নেই; বরং সামান্যতম সন্দেহ দেখা দিলেই হদ্দ রহিত হয়ে যায়।[২৭] এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো– ادْفَعُوا الْحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ له مَدْفَعًا-''হদ্দ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকো, যেযাবত তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ তোমরা খুঁজে পাও।"[২৮] বিভিন্ন সূত্রে এ কথাও বর্ণিত রয়েছে– ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ - "সন্দেহের কারণে হুদূদ রহিত করো।"[২৯] এ নির্দেশই পরবর্তীকালে ইসলামী আইনের একটি স্বীকৃত মূলনীতিতে রূপ লাভ করেছে– الْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ -"হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকার্যকর হয়ে পড়ে।"[৩০]

এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ আমরা সুন্নাতে নববীতে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। বর্ণিত আছে, মায়িয আল-গামিদিয়্যাহ রা. যখন নিজ উদ্যোগে নিজের বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ স্বীকার করে নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সেই স্বীকারোক্তি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বারবার প্রশ্ন করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং বিভিন্নভাবে তাকে প্রত্যাহারের পথ দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি যাচাই করেন– স্বীকারকারিণী মানসিকভাবে সুস্থ কি না, স্বীকারোক্তির পেছনে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশ আছে কি না।[৩১] এ ঘটনাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে হদ্দ প্রয়োগই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবিকতা রক্ষা এবং বিচারিক সতর্কতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। হদ্দ আরোপের ক্ষেত্রে যদি সামান্যতম সন্দেহ, গ্রহণযোগ্য অজুহাত বা বিকল্প ব্যাখ্যার সুযোগ বিদ্যমান থাকে, তবে তা বিবেচনায় নিয়ে শাস্তি কার্যকর না করে তা রহিত করাই শরীয়তের কাম্য। ফিকহের পরিভাষায় এ নীতিকে 'শুবুহাতের মাধ্যমে হদ্দ রহিত করার নীতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুতরাং, মায়িয রা.-এর

27. Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d., 4:17
28. Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad. *As-Sunan.* Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d., Hadith No.: 2545; Albani said this Hadith is week by its Sanad.
29. Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad. *As-Sunan al-Kubrā.* Hadith No.: 17515; *As-Sunan al-Sugrā.* Hadith No.: 3313
30. Muḥammad Amīn Amīr Bādshāh. *Taysīr al-Taḥrīr.* Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d., 4:81; Alā' al-Dīn al-Bukhārī. *Kashf al-Asrār.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, 4:517;Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn. *Al-Baḥr al-Rā'iq.* Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, n.d., 7:1.
31. See more, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Aṣ-Ṣaḥīḥ.* op.cit., Hadith No: 4527, 4528

ঘটনার মাধ্যমে ইসলামী বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়–তাহলো, হদ্দ প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা, প্রমাণের দৃঢ়তা এবং মানবকল্যাণের প্রতি গভীর সংবেদনশীলতা।

অতএব, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ন্যায়সঙ্গত প্রমাণনীতি এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক ও নৈতিক প্রস্তুতি ব্যতীত ফৌজদারি আইনে হস্তক্ষেপ করা হলে তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মাকাসিদুশ শরীয়া–বিশেষত জীবন সংরক্ষণ, বুদ্ধির সুরক্ষা ও মানবমর্যাদা রক্ষার মৌলক উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার বাস্তব আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী আইন নিজেই ফৌজদারি ক্ষেত্রে ধীরতা, সংযম ও সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় যে, যেসব মুসলিম দেশে শরীয়া ফৌজদারি আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে এ পদক্ষেপ সাধারণত রাষ্ট্রীয় ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ও সবচেয়ে সংবেদনশীল ধাপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক জিয়াউল হক-এর ইসলামিকরণ নীতির অংশ হিসেবে হুদূদ অধ্যাদেশ প্রবর্তিত হয়। এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শরীয়া ফৌজদারি আইন প্রয়োগ কেবল একটি আইনগত সংস্কারের বিষয় নয়; বরং এটি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, কঠোর প্রমাণনীতির বাস্তবায়নযোগ্যতা এবং মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক ও জটিল আইনি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক দৃষ্টান্ত, যা ফৌজদারি আইন ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে হঠাৎ ও পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের পরিবর্তে সংযত, বাস্তবানুগ ও পর্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে।[৩২]

32. ইসলামের ইতিহাসেও হুদুদ আইনের প্রবর্তনে–বিশেষত যিনা ও মদ্যপানসংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে–পর্যায়ক্রমিক নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যিনার শাস্তির বিধান শুরুতেই চূড়ান্ত দণ্ড আকারে প্রবর্তিত হয়নি; বরং প্রাথমিক পর্যায়ে যিনার অপরাধে ঘরে আটকে রাখার অর্ন্তবর্তী বিধান দেওয়া হয়, যা ছিল সামাজিক সংশোধন ও নৈতিক সংযম সৃষ্টির একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা। পরবর্তী সময়ে সমাজের নৈতিক শুদ্ধতা, ঈমানী সচেতনতা এবং সামষ্টিক শালীনতা সুদৃঢ় হলে যিনার নির্দিষ্ট হদ্দের বিধান নাযিল হয়। অনুরূপভাবে, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞাও ধাপে ধাপে কার্যকর করা হয়–প্রথমে নৈতিক সতর্কতা, পরে নামাযের সময় সীমাবদ্ধতা এবং সর্বশেষে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে। মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রেও পর্যায়ভিত্তিক প্রয়োগনীতি অনুসৃত হয়েছে–রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খলীফা আবু বকর রা.-এর আমলে মদ্যপানের জন্য কোনো নির্ধারিত দণ্ডবিধি ছিল না; পরিস্থিতি ও সামাজিক বাস্তবতায় বিবেচনায় উপদেশমূলক বা তাৎক্ষণিক শাস্তির মাধ্যমে বিষয়টি মোকাবেলা করা হতো। সর্বপ্রথম খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর খিলাফতকালে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে মদ্যপানের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ড–৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, যা ইসলামী আইনের প্রকৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশকে প্রতিফলিত করে। এ ছাড়া তাঁর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের সময় চুরির হদ্দ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ইসলামী আইন প্রয়োগে সামাজিক বাস্তবতা, ন্যায়বিচার ও মানবিক বিবেচনার গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তোলে ধরে। এসব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত পথ হিসেবে কয়েকটি ধাপ বিবেচনায় আনা যেতে পারে–

ক. আপাতত সরাসরি 'হুদূদ শাস্তি' প্রবর্তনের পরিবর্তে শরীয়া ফৌজদারি আইনের নৈতিক ও প্রতিরোধমূলক দর্শনকে আধুনিক দণ্ডবিধির কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, উচ্চমানের প্রমাণনীতি, শাস্তির অনুপাতিকতা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং ভুক্তভোগীর অধিকার– এসব মৌলিক নীতিকে ইসলামী ফৌজদারি দর্শনের আলোকে পুনর্ব্যাখ্যা করে বিদ্যমান দণ্ডবিধি সংস্কারের সুযোগ রয়েছে।

খ. আরেকটি সম্ভাব্য ধাপ হতে পারে কিসাস ও দিয়াতের ধারণাকে সীমিত পরিসরে বিকল্প প্রতিকারমূলক ন্যায়বিচারের কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করে পর্যালোচনা করা। তবে এ উদ্যোগ আপাতত বাধ্যতামূলক শাস্তি হিসেবে নয়; বরং ভুক্তভোগীর স্বতঃস্ফূর্ত ও অবগত সম্মতির ভিত্তিতে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করে এবং আদালতের বিবেচনাধিকারাধীন একটি ঐচ্ছিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত হবে। একই সঙ্গে, এ ধরনের যে কোনো নীতিগত উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংবিধানে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত মৌলিক অধিকারসমূহের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়া ফৌজদারি আইন কার্যকরকরণ একটি বহু পূর্বশর্তসাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সফল ও ন্যায়সঙ্গত বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ অপরিহার্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. বিচারব্যবস্থার পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, যাতে আইন প্রয়োগ কোনো রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাবের অধীন না থাকে;

খ. উচ্চমানের প্রমাণনীতি ও কার্যকর তদন্তব্যবস্থা, যা ভুল রায় ও বিচারিক অবিচার প্রতিরোধে সক্ষম;

গ. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস; কারণ গভীর সামাজিক অসমতা বিদ্যমান থাকলে দণ্ডমূলক আইন প্রয়োগ ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে;

ঘ. ব্যাপক জনসমর্থন ও আলিম-আইনজ্ঞদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঐকমত্য, যাতে আইন প্রয়োগ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও নৈতিক বৈধতা লাভ করে।

এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ না করে শরীয়া ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করলে ইসলামী ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জন নাও হতে পারে। সেই সাথে আইনি জটিলতা সৃষ্টি এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি জনআস্থার অবক্ষয়ের আশঙ্কা থেকে যায়।

প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়া আইন প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য শাস্তি আরোপ নয়; বরং সমাজকে নৈতিকভাবে প্রস্তুত করা, অবিচার প্রতিরোধ করা এবং সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও পর্যায়ভিত্তিক প্রয়োগই ইসলামী আইনদর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের সম্ভাব্য ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ায় ফৌজদারি আইনকে প্রথম ধাপে উন্নীত করা সমীচীন নয়; বরং এটিকে সর্বশেষ ও সবচেয়ে সংবেদনশীল ধাপ হিসেবে বিবেচনা করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান বাস্তবতায় এটি আপাতত সরাসরি আইন প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ না হয়ে, বরং সামাজিক প্রস্তুতি, সাংবিধানিক পুনর্বিবেচনা এবং বিচারিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে একটি নীতিগত স্তরে রাখা অধিক বাস্তবসম্মত। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের আইনগত ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে পরিচালিত শরীয়া প্রয়োগ মডেলের সঙ্গে অধিক সাজুয্যপূর্ণ হবে বলে মনে হয়। এ ধরনের মডেল পূর্ণাঙ্গ শরীয়া রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক রূপান্তরমুখী মডেলের তুলনায় সংযত, পর্যায়ক্রমিক এবং সমসাময়িক সামাজিক-আইনগত বাস্তবতার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পথ নির্দেশ করে।

১২. প্রস্তাবনা ও পরামর্শ

১. প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ আইন সরাসরি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ও বাতিলযোগ্য; কোন্ কোন্ আইন ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ; আর কোন্ কোন্ আইন আংশিকভাবে সংশোধনযোগ্য বা ইসলামী আইনের সঙ্গে অভিযোজনযোগ্য– তা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা।

২. ইসলামী আইনের একটি পরিপূর্ণ, ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য ও বিধিবদ্ধ রূপরেখা প্রণয়ন করা।

৩. বিশিষ্ট ফকীহ, আইনবিদ, সংবিধানবিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন গঠন করা। এই কমিশন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ও সংস্কারে রূপরেখা তৈরি করার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী আইন, তুলনামূলক ফিকহ, সংবিধান ও আধুনিক আইন চর্চার সমন্বয়ে বিশেষায়িত বিভাগ ও ইনস্টিটিউট স্থাপন করা। পাশাপাশি নিয়মিত গবেষণা, জার্নাল প্রকাশ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা।

৫. ইসলামী আইনের প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধির ও তাদের ভীতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক ফোরামের পাশাপাশি ধর্মীয় খুতবা ও ওয়াজে ইসলামী আইন বিষয়ে তথ্যভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা নিয়মিত চালু রাখা।

৬. বিভিন্ন মাযহাবের বিজ্ঞ ফকীহ ও সমসাময়িক গবেষকদের নিয়ে একটি জাতীয় ফিকহ বোর্ড গঠন করা। এই বোর্ড মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য মতামত প্রদান করবে।

৭. বিচারক, আইনজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামী আইন ও তুলনামূলক আইন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

১৩. উপসংহার

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ইসলামিকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ উদ্যোগকে কেবল আদর্শগত প্রত্যাশার আলোকে মূল্যায়ন করলে তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বরং এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং মানবিক মর্যাদা ও সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়া।এই গবেষণায় আলোচিত সমস্যা ও উত্তরণের উপায়গুলো নির্দেশ করে যে, আইন ইসলামিকরণ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুসংগঠিত গবেষণা, তুলনামূলক আইন বিশ্লেষণ এবং সামাজিক বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। ধাপে ধাপে আইন সংস্কার, সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে ইসলামী মূলনীতির সমন্বয়, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং জনসচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপের সম্মিলিতভাবে একটি কার্যকর রূপান্তরের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনসমর্থন এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শরীয়ার মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যাবলিকে কেন্দ্র করে ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা কেবল ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলনই নয়; বরং একটি আদর্শ, স্থিতিশীল ও টেকসই রাষ্ট্র গঠনে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Bibliography

Al-Qur’ān al-Karīm.

‘Abd al-Razzāq aṣ-Ṣan‘ānī. *Al-Muṣannaf.* Bayrūt: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 AH.

Abū Dāwūd, Sulaymān. *As-Sunan.* Bayrūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, n.d.

Aḥmad ‘Alī. *Islāmī Banking-e Sharī‘ah Paripālan o Laṅghan: Samasyā o Uttaraṇ Bhābnā.* Ḍhākā: Prachchhad Prakāshan, 2025.

Aḥmad ‘Alī. *Islāmī Shāsti Āin.* Ḍhākā: Bangladesh Islamic Center, 2025.

Aḥmad ‘Alī. *Tulonāmulok Fiqh.* Ḍhākā: Bangladesh Islamic Law Research Center, 2019.

Alā’ al-Dīn al-Bukhārī. *Kashf al-Asrār.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Alimuzzamān Chowdhurī. *Islamic Jurisprudence o Muslim Āin.* Ḍhākā: Comilla Law Book House, 2008.

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined.* Edited by Sarah Austin. London: John Murray, 1861.

Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad (384–458 AH). *As-Sunan al-Kubrā.* Ḥaydarābād: Majlis Dā’irat al-Ma‘ārif, 1344 AH.

Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England.* Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1765.

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ.* Taḥqīq: Dr. Muṣṭafā Dīb al-Bughā. Bayrūt: Dār Ibn Kathīr, 1987.

Coulson, N. J. *A History of Islamic Law.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

Ḥabībur Raḥmān. *Islamic Jurisprudence o Muslim Āin.* Ḍhākā: Amin Law Book Center, 2008.

Hart, H. L. A. *The Concept of Law.* Oxford: Clarendon Press, 1961.

Holland, Thomas Erskine. *Elements of Jurisprudence.* Oxford: Oxford University Press, 1880.

Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk.* Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad. *As-Sunan.* Taḥqīq: Muḥammad Fu’ād. Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.

Ibn al-Nadīm. *Al-Fihrist.* Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, 1978.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn. *Al-Baḥr al-Rā’iq.* Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, n.d.

Ibn Sa‘d. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā.* Bayrūt: Dār Ṣādir, n.d.

Kattān, Mannā‘ Khalīl. *Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī.* Al-Qāhirah: Maktabat Wahbah, 2001.

Mawdūdī, Sayyid Abū al-A‘lā. *Islāmī Āin o Saṅbidḥān* (trans. Muḥammad ‘Abdus Salām). Ḍhākā, 2008.

Muḥammad Amīn Amīr Bādshāh. *Taysīr al-Taḥrīr.* Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Aṣ-Ṣaḥīḥ.* Bayrūt: Dār al-Jīl, n.d.

Nasā’ī, Aḥmad (215–303 AH). *As-Sunan al-Kubrā.* Al-Maktabah al-Shāmilah.

Rūḥul Amīn. *Islāmī Āiner Uts.* Ḍhākā: Bangladesh Islamic Law Research Center, 2013.

Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt.* Bayrūt: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Shāhedī, Muḥammad ‘Īsā, ed. *Prachalita Bichārabyabasthāy Sharī‘ah Āiner Prayōg-Paddhati (Seminar Smārak).* Ḍhaka: Baytush Sharaf Islāmī Gabeshanā Kendra, 2025.

Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* Bayrūt: Dār al-Fikr, 1986.